যাকাতের বিধিবিধান

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

যাকাতের বিধিবিধান

সিজেডএম শরিয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ ও পঞ্চম প্রকাশ :
আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
সফর ১৪৪৫ হিজরি

প্রচ্ছদ :
হাবিবুর রহমান রাজু

অলংকরণ :
রিফাত মাহমুদ

মুদ্রণ :
চৌকস প্রিন্টার্স

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রকাশক :
সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)
ফোন : +৮৮ ০২ ২২২২ ৯৮ ২৫৫, ০১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬
ই-মেইল : info@czm-bd.org
ওয়েবসাইট: www.czm-bd.org

নিবেদন

যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। তাওহীদ ও সালাতের পরই এর স্থান। যাকাত পরিশোধ করা প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য অবশ্যকর্তব্য। তাই একজন মুসলিমের জীবনে এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি প্রতিপালন করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে আখেরাতে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। এ ছাড়া যাকাতের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহর নির্দেশিত আটটি খাতে যাকাত বিতরণ করা হলে সমাজে আয়-বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং অসহায় মানবতা কল্যাণ লাভ করবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম প্রধান দেশে একদিকে যেমন সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করা হয় না, অপরদিকে যথাযথভাবে বিতরণও করা হয় না। যাকাতের মতো একটি ইবাদত পরিপালনের জন্য যাকাতের সকল বিধিবিধান প্রত্যেকের জানা কর্তব্য। পরিতাপের বিষয় হলো, বাংলা ভাষায় যাকাত বিষয়ক প্রকাশনার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট যাকাতের মৌলিক বিধিবিধানগুলো পাঠকের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে 'যাকাতের বিধিবিধান' শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন ড. জুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), জনাব মিজানুর রহমান (পিএইচডি গবেষক) ও মাওলানা মোখতার আহমেদ।

পাণ্ডুলিপিটি সংক্ষিপ্ত আকারে সিজেডএম-এর শরিয়াহ বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের সম্মিলিত অভিমতের সমন্বয় ঘটিয়ে যাকাত-সংক্রান্ত মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো এ পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উক্ত শরিয়াহ বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন : মুফতি কাযী মুহাম্মদ ইবরাহিম, প্রফেসর মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, ড. জুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. মানজুর-ই-ইলাহী, ড. সাইফুল্লাহ, মাওলানা শাহ ওয়ালী উলাহ, মাওলানা মোখতার আহমেদ ও জনাব আজহারুল ইসলাম।

আগ্রহী পাঠকবৃন্দ এ পুস্তিকা থেকে উপকত হলে আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ আমাদের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন।

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট

তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার

-আল কুরআন ৫১:১৯

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
যাকাতের অর্থ ও তাৎপর্য ৭-১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি ১৯-২৫

তৃতীয় অধ্যায়
যাকাতযোগ্য সম্পদের নিসাব ২৬-২৭

চতুর্থ অধ্যায়
সোনা ও রুপার যাকাত ২৮-৩৩

পঞ্চম অধ্যায়
নগদ অর্থ বা মুদ্রার যাকাত ৩৪-৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রদত্ত ঋণের যাকাত ৩৭-৪০

সপ্তম অধ্যায়
ব্যবসায়িক ও শিল্পপণ্যের যাকাত ৪১-৪৮

অষ্টম অধ্যায়
কোম্পানির, শেয়ার ও স্টকের যাকাত ৪৯-৫৭

নবম অধ্যায়
জমিজমা ও ইজারা সম্পত্তির যাকাত ৫৮-৬৫

দশম অধ্যায়
গবাদি পশুর যাকাত ৬৬-৭১

একাদশ অধ্যায়
উশর বা শস্য-ফসল ও ফলের যাকাত ৭২-৭৯

দ্বাদশ অধ্যায়
অন্যান্য সম্পদের যাকাত ৮০-৮২

ত্রয়োদশ অধ্যায়
যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ ৮৩-৯৩
যাকাত ক্যালকুলেটর (ব্যক্তিগত) ৯৪
যাকাত ক্যালকুলেটর (একক বা যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায়) ৯৫

প্রথম অধ্যায়
যাকাতের অর্থ ও তাৎপর্য

যাকাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

'যাকাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি ও প্রশংসা। পারিভাষিক অর্থে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে নির্দিষ্ট সময় পর ঐ সম্পদের একটি অংশ শরিয়াহ নির্ধারিত খাতে বণ্টন করাকে 'যাকাত' বলে। এখানে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ' মানে 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদ। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে 'সাহিবে নিসাব' বলা হয়। আর 'নির্দিষ্ট সময়' বলতে এক চন্দ্রবছর এবং 'নির্ধারিত খাত' বলতে যাকাত প্রদানের ৮টি খাতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাকাত বলতে ঐ সম্পদকে বোঝায়, যা আল্লাহর নির্দেশে বছরান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারীগণ নির্দিষ্ট খাতে বণ্টন করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করাকে যেমনি যাকাত বলে, তেমনি দানকৃত সম্পদকেও যাকাত বলা হয়।[১]

যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

"তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" সূরা জারিয়্যাত, ৫১ : ১৯

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীরা নিজেদের সম্পদে থাকা অপরের 'হক' (অধিকার) হস্তান্তর করেন। ফলে একদিকে তাদের সম্পদ পবিত্র হয়, অপরদিকে তাদের মন কৃপণতার কলুষতা হতে পবিত্রতা লাভ করে। যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ আবর্তিত হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ হ্রাস পায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বেড়ে যায়। তা ছাড়া যাকাতের কারণে নেকির পরিমাণও বর্ধিত হয়। এভাবে দেখা যায়, শব্দটির মূল আভিধানিক অর্থ তথা 'পবিত্রতা' ও 'উন্নতি' যাকাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

---

[১] ইবনুল আরাবীর মতে, যাকাত বলতে ওয়াজিব যাকাত, ঐচ্ছিক দান, পারিবারিক ব্যয় ও ক্ষমাকে বোঝানো হয়। (মাওসুআ)

কুরআন ও সুন্নাহয় ব্যবহৃত যাকাতের সমার্থক পরিভাষাসমূহ

কুরআন ও হাদীসে যাকাতের সমার্থবোধক বা কাছাকাছি অর্থের আরো কিছু পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

ক. সাদাকা (الصدقة)

কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'যাকাত' (সুনির্ধারিত আবশ্যকীয় দান) অর্থে 'সাদাকা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ হতে সাদাকা গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" সূরা তাওবা, ৯ : ১০৩

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

"সাদাকা তো ফকির ও মিসকিনদের জন্য..." সূরা তাওবা, ৯ : ৬০

রাসূল সা. বলেছেন, "পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে সাদাকা নেই।" মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রাসূল সা. বলেছিলেন, 'তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পদে সাদাকা ফরজ করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে।' যাকাত সংগ্রহকারীকে 'মুসাদ্দিক' বা সাদাকা সংগ্রহকারী বলা হতো। ওপরের আয়াত ও হাদীসগুলোতে 'সাদাকা' শব্দটি 'যাকাত' তথা 'অত্যাবশ্যকীয় দান'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. আতিয়্যাহ (العطية)

আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা ভালোবাসার জন্য মানুষ যা কিছু দান করে তাই 'আতিয়্যাহ' হিসেবে গণ্য হয়। এ পরিভাষাটি যাকাত, সাদাকা, হেবা এবং অনুরূপ দানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ. ইনফাক (الإنفاق)

যাকাতের কাছাকাছি অর্থের আরেকটি পরিভাষা হলো 'ইনফাক'। ইনফাক একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। যাকাত ও সাদাকাসহ পুণ্য ও কল্যাণের পথে সর্বপ্রকার ব্যয় ইনফাকের অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীকে মোহর প্রদান এবং পিতামাতার ভরণপোষণের ক্ষেত্রেও আল-কুরআনে 'ইনফাক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইনফাক' শব্দের সাথে 'ফি সাবিলিল্লাহ' বাক্যাংশ যুক্ত হলে সাধারণত আল্লাহর পথে জিহাদে অর্থব্যয় করাকে বোঝানো হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুরুর দিকে যাকাত ও সাদাকা সমার্থবোধক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ধীরে ধীরে ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে দুটো পরিভাষা পৃথক হয়ে যায়। আবশ্যক দান ফরজ দানের জন্য যাকাত পরিভাষাটি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর সর্বপ্রকারের 'ঐচ্ছিক দান' বোঝাতে সাদাকা শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যাকাত ও সাদাকার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

যাকাত	সাদাকা
যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করা;	সাদাকা শব্দের অর্থ সত্যবাদিতা অর্থাৎ ঈমানের সত্যতা প্রমাণে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করা।
যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ, সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর যাকাত আদায় করা ফরজ;	সাদাকা ইসলামের স্তম্ভ নয়, সাদাকা দেওয়া সাওয়াবের কাজ; তবে এটি ফরজ নয়।
যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়;	সাদাকা প্রদান না করলে কোনো শাস্তি নেই।
যাকাত অস্বীকারকারীর জন্য পরকালীন শাস্তি রয়েছে।	সাদাকা না দিলে ফযিলত ও সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে, তবে কেন শাস্তি নেই।
যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত;	যেকোনো সম্পদ হতে সাদাকা করা যায়, এর কোনো নিসাব বা আদায়ের পরিমাণ নেই।
যাকাতের প্রদানের হার সুনির্ধারিত;	'ঐচ্ছিক দান' বলে সাদাকার সুনির্দিষ্ট কোনো হার নেই।

প্রতি চন্দ্রবছরে একবার যাকাত প্রদান করা ফরজ;	প্রতি বছর সাদাকা না দিলে কোনো অসুবিধা নেই। আবার এক বছরে একাধিকবারও সাদাকা দেওয়া যায়।
সুনির্দিষ্ট খাতের বাইরে যাকাত বণ্টন করা যায় না;	যেকোনো কল্যাণমূলক খাতে সাদাকার অর্থ ব্যয় করা যায়।

সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে যাকাত ও সাদাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাকাত অত্যাবশ্যকীয় দান, এর দাতা ও গ্রহীতা নির্ধারিত। মুসলিম সমাজের সদস্যরা যদি যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো দান না করে তবে সমাজের অনেক প্রয়োজন বা জরুরি কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। তাই যাকাত প্রদানের পাশাপাশি সাদাকা প্রদানেও এগিয়ে আসা উচিত।

যাকাত ও আয়কর

অনেকে ভুলবশত যাকাত ও আয়কর অভিন্ন মনে করেন এবং এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যাকাত হতে অব্যাহতি পেতে চান। তাদের যুক্তি হলো রাসূল সা. ও খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করা হতো। বর্তমানে সরকার সামর্থ্যবান নাগরিকের কাছ থেকে কর আদায় করে। তা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সরকারি কর্তব্য। তাই যারা সরকারকে কর প্রদান করে তাদের ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করতে হবে না। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যাকাত ও আয়কর এক নয়। এ দুটোর মাঝে উৎস ও বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। আয়কর প্রদান করলে কিছুতেই যাকাত হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। নিম্নের সারণীতে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হলো :

যাকাত	আয়কর
যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ;	কর প্রদান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।
যাকাত বিধানের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ;	করসংক্রান্ত আইন/বিধানের উৎস আইনসভা বা সরকার।

যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ (নিসাব) সুনির্দিষ্ট এবং চিরদিনের জন্য অপরিবর্তনীয়;	করযোগ্য সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়; সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে তা নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয়।
যাকাতের হার সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত;	কর প্রদানের হার পরিবর্তনশীল।
যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ কুরআন দ্বারা নির্ধারিত;	করের অর্থ দ্বারা সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মেটানো হয়।
যাকাত সরকারি ও বেসরকারি দুভাবেই বণ্টন করা যায়।	কর সংগ্রহ ও ব্যয় একমাত্র সরকারই করতে পারে।
যাকাত দ্বীনি বিধান হওয়ায় এটি কেবল মুসলিমের ওপর ফরজ;	আয়করের বিধান সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য।
যাকাত প্রদানের বিষয়ে কেউ কাউকে অব্যাহতি দিতে পারে না;	সরকার নাগরিকদের কর প্রদান হতে অব্যাহতি দিতে পারে।
যাকাত সমানুপাতিক হারে (proportionate) নির্ধারণ করতে হয়।	করের হার সমানুপাতিক (proportionate), প্রগতিশীল (progressive) ও অধঃগতিশীল (regressive)।

যাকাতের তাৎপর্য

সালাত শারীরিক ইবাদত হওয়ায় শুধু 'আল্লাহর হক'-এর সাথে সম্পৃক্ত। আর যাকাত আর্থিক ইবাদত হওয়ায় এর সাথে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের 'হক' জড়িত। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা সম্ভব; অপরদিকে দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে সমাজকে মুক্ত করাও সম্ভব। নিম্নে যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরা হলো—

ক. যাকাতের দ্বীনি তাৎপর্য

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ। ফরজ আমলগুলোর মধ্যে সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। কুরআনে অন্তত ২৮টি স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানরা একটি ফরজ ইবাদত আদায় করেন। সুতরাং যাকাতের ধর্মীয় তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রথমত : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর কলুষমুক্ত হয়। সম্পদের লোভ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; এটির নিয়ন্ত্রণেই মানুষের কল্যাণ। যাকাত মানুষের কাছে এ সুযোগ এনে দেয়। প্রতিবছর যাকাত আদায় করলে মানুষের মন লোভ-লালসা ও কৃপণতার ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করে। আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যাকাত পাপমুক্তির সুযোগ এনে দেয়। মানুষের মাঝে সর্বদা সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির লড়াই বহমান। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। যাকাত ও সাদাকা প্রদান করলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের গুনাহ মাফ করে দেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। কিন্তু যদি গোপনে দান করো এবং তা অভাবী লোকদের দাও, তবে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। আর তিনি (দানের কারণে) তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দেবেন। তোমরা যা করো, তিনি তার খবর রাখেন।" সূরা বাকারা, ২ : ২৭১

তৃতীয়ত : যাকাত প্রদান করলে সম্পদ পবিত্র হয়। সম্পদ নিরঙ্কুশভাবে মানুষের অর্জন নয়। আল্লাহ পৃথিবীময় সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে তা অর্জন করে। তাই বলে সম্পদকে কেবল নিজস্ব চেষ্টার ফল বলে ধরে নেওয়া যায় না। আমরা দেখি, বহু মানুষ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও সম্পদ উপার্জন করতে পারে না। আবার কেউ কেউ সহজেই বিশাল সম্পদের মালিক হয়। কারণ, রিযিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার রশি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি ধনীদের সম্পদ দেওয়ার পাশাপাশি তাতে গরিবের হক রেখে দিয়েছেন। কুরআনের ভাষ্য—

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

"তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক।" সূরা যারিয়্যাত, ৫১ : ১৯

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হক বলে এটিকে 'আল্লাহর হক' বলেও অভিহিত করা হয়। যাকাত আদায় না করলে ধনীর সম্পদে আল্লাহ ও গরিবের হক থেকে যায়। অপরের হক বিদ্যমান থাকায় সম্পদ পবিত্র হয় না। তাই যাকাত

প্রদানের মাধ্যমে ধনীরা তাদের সম্পদে বিদ্যমান অপরের হক আদায় করতে সমর্থ হন। এভাবে তাদের সম্পদ পবিত্র হয়। সম্পদ পবিত্রকরণে যাকাতের ভূমিকার বিষয়ে রাসূল সা. বলেন—"আল্লাহ তো যাকাত ফরজ করেছেন তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র করার জন্য।"—*সুনানে আবু দাউদ*

চতুর্থত : যাকাত আদায় করলে সম্পদ নিরাপদ হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাত আদায় করলে সম্পদ পবিত্র হয়। পবিত্র সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদ ও দুর্যোগ হতে নিরাপদ রাখেন। আয়িশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেছেন—"কোনো সম্পদে যাকাত মিশ্রিত হলে তা ঐ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।" অর্থাৎ যাকাত আদায় না করলে তা মূল সম্পদের সাথে মিশে যায়, ফলে তা ধ্বংস হয়। ভিন্নভাবে বললে, যাকাত আদায়ে সম্পদ নিরাপদ হয়।

খ. যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

যাকাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর অশান্তির অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য।[২] মজার ব্যাপার হলো—সম্পদের স্বল্পতা দারিদ্র্যের কারণ নয়; পৃথিবীতে কখনো সম্পদের স্বল্পতা ছিল না, এখনো নেই। দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো কিছু শ্রেণির মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া আর অবশিষ্ট জনগণ সম্পদশূন্য হওয়া। জানুয়ারি ১৬, ২০১৭ তারিখে রয়টার্সে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আট শীর্ষ ধনীর হাতে রয়েছে পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেক। অর্থাৎ উক্ত আট ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ আছে তা বর্তমান পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের সম্পদের সমান।

যাকাত কেন্দ্রীভূত সম্পদের ভান্ডারকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। যাকাত ব্যবস্থায় ধনী হতে দরিদ্রের মাঝে, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভান্ডার হতে বিপুল জনগোষ্ঠীর হাতে সম্পদ আবর্তিত হয়। ফলে বৈষম্য হ্রাস পায়।

একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো যে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন নেই। মৌলিক খরচের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক চন্দ্রবছর হাতে থাকলেই যাকাত দিতে হয়। আবার যাকাতের পরিমাণও খুব বেশি নয়, মাত্র ২.৫% ভাগ। কারণ ইসলাম চায় না সচ্ছল ব্যক্তি যাকাত দিতে গিয়ে আবার গরিব হয়ে যাকাতের হকদারের শ্রেণিতে নেমে আসুক।

---

[২] অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস একজন অর্থনীতিবিদ। তবুও তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (২০০৬)। বিশেষজ্ঞদের মতে, দারিদ্র্য অশান্তির মূল কারণ। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অশান্তি দূরীকরণে ভূমিকা রাখার জন্য ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

এভাবে যাকাতদাতা ও গ্রহীতার মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবধান খুব দ্রুত সংকীর্ণ হয়ে আসবে। আর তাই বলা যায়, বণ্টন বৈষম্য দূর করে যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, ফলে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়।

যাকাতের বিধানে ধনীদের জন্যও সুরক্ষা আছে। প্রথমত, যাকাতের পরিমাণ একেবারেই কম (২.৫%), দ্বিতীয়ত, সম্পদ বর্ধনশীল হওয়ার শর্ত, এর উদ্দেশ্য হলো যাকাত দিতে গিয়ে ধনী যেন আবার দরিদ্র হয়ে না পড়ে।

গ. উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাকাতের ভূমিকা

সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সচ্ছলতার অভাবে সাধারণ ভোক্তারা পণ্য ক্রয় করতে পারে না। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে চাহিদা কমে, আর চাহিদার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পায়। তা ছাড়া কেবল ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ থাকলে তা বাজারের পণ্যবৈচিত্র্যে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। ধনী ভোক্তাদের পণ্য শ্রেণি পৃথক। ফলে সাধারণ ভোক্তাদের ওপর নির্ভরশীল এমন শিল্প তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাকাতের মাধ্যমে গরিবের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা গতিশীল হয়।

অর্থনীতির সূচকগুলোর একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের সাথে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। দরিদ্রদের হাতে পুঁজি না থাকায় তারা কোনো বিনিয়োগ করতে পারে না। তাদেরকে যাকাত দেওয়া হলে তারা তা উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে। উৎপাদনে গতি আসার কারণে কর্মসংস্থান বেড়ে যায়। আবার কর্মসংস্থান বেড়ে যাওয়ায় বেকারত্ব দূর হয়। সাধারণত দেখা যায়, সামাজিক অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ বেকারত্ব। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে বেকারত্ব হ্রাস পায়। তাই অপরাধ প্রবণতা হ্রাসের ক্ষেত্রে যাকাতেরও ভূমিকা রয়েছে।

ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইরশাদ করেন–

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

"এমন ব্যক্তি কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন এবং আল্লাহই সীমিত ও প্রসারিত করে থাকেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" সূরা বাকারা, ২ : ২৪৫

অন্য আয়াতে বলেন–

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ

"আল্লাহ যার ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যার ইচ্ছা সংকুচিত করেন।" সূরা রা'দ, ১৩ : ২৬

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ﴿۳۰﴾

"নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনপোকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিত করেন।" সূরা বনি ইসরাইল, ১৭ : ৩০

সম্পদ ও দারিদ্র্য দুটো দিয়েই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান যে, সম্পদের মালিক হয়ে ধনীরা তাঁর প্রতি শোকর আদায় করে কি না এবং দরিদ্রদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কি না। আর দরিদ্ররা তাদের অসচ্ছল অবস্থা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য সুন্দরভাবে প্রচেষ্টা চালায় কি না। ফরজ ইবাদত হিসেবে যিনি যাকাত আদায় করেন তার মনে কখনো প্রদর্শনেচ্ছা বা নাম কুড়ানোর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন–

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿۱۹﴾

"ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।" সূরা জারিয়াত, ৫১ : ১৯

অতএব, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি তার সম্পদে থাকা গরিবের হক আদায় করেন। তাই তার মনে অহংকার বা দানশীলতার গর্ব সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। ফলে গরিবরা স্বভাবতই যাকাত প্রদানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এভাবে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, সম্মানপ্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতাবোধের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ইসলাম শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিভেদের অজুহাত তুলে সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় না।

এর পরিবর্তে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যা যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে সৃষ্টি করা সম্ভব।[৩]

ঙ. যাকাত আদায়ের মর্যাদা

যাকাত আদায়ের অনেক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যাকাত কবরে মানুষকে রক্ষা করবে। একটি দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে যে, একজন মুমিনকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তার আমলগুলো চতুর্দিকে অবস্থান নেয়; তার মাথার কাছে সালাত, ডান পাশে সাওম, বাম পাশে যাকাত ও পায়ের দিকে অবস্থান নেয় নফল আমলগুলো। অতঃপর এগুলো বর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন করে তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করে। আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায়কারীদের ভুলত্রুটি ও পাপমোচন করবেন এবং তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۭ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ﴿١٢﴾

"আল্লাহ বনি ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন নকীব নিয়োগ করেছিলাম। আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখো, তাঁদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাকো; তাহলে অবশ্যই তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবো এবং অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের দাখিল করব জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচ দিয়ে বহমান থাকবে নহর।" সূরা মায়িদা, ৫ : ১২

---

[৩] এই উপ-শিরোনামে যাকাতের তাৎপর্য সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে তা তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন সমন্বিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার আলোকে যাকাতের অর্থ বিলি-বণ্টন করা হবে। বর্তমানে যাকাত বিতরণে যে দুরবস্থা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে যাকাতের কোনো সুফল অর্জন করা সম্ভব নয়। এটি আল্লাহর বিধানের ব্যর্থতা নয়; বরং ঐসব মানুষের ব্যর্থতা যারা খেয়ালখুশিমতো আল্লাহর বিধান পালন করে।

চ. যাকাত আদায় না করার পরিণতি

আল্লাহর সকল বিধান মানুষের সর্বজনীন কল্যাণের জন্য। আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি আদেশ-নিষেধের দুই ধরনের ফলাফল বা পরিণতি রয়েছে; ইহকালীন ও পরকালীন। পরকালীন পরিণামই মুখ্য। তবে ইহকালীন পরিণামও আছে; যদিও অনেক সময় মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

প্রথমত : ধনীর সম্পদে যেহেতু দরিদ্র ও নিঃস্বের অধিকার আছে; তাই যাকাত আদায় না করলে সম্পদে অপরের অধিকার থেকে যায়। ফলে তা পবিত্র হয় না। অপবিত্র সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন না এবং ঐ সম্পদের মালিক আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয়, যে জনগোষ্ঠী যাকাত বা সাদাকা আদায় করে না আল্লাহ তাদের ওপর খরা ও দুর্ভিক্ষের মতো দুনিয়াবি শাস্তি প্রেরণ করেন। রাসূল সা. বলেন, "কোনো সম্প্রদায় যাকাত দানে অস্বীকৃত হলে আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি দেন।"—*তাবারানী*

দ্বিতীয়ত : রাসূল সা. বলেন, "যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় যাকাত দেবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। আর যে যাকাত দেবে না, আমরা তার সম্পদ হতে যাকাত আদায় করবই; উপরন্তু আমাদের রবের কড়া নির্দেশের আলোকে তার সম্পদের একাংশ নিয়ে নেব। তবে মুহাম্মদের পরিবারের জন্য এর কোনো অংশই হালাল নয়।"—*মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসায়ি, সুনানে আবু দাউদ*

এ হাদীস হতে বোঝা যায়, কেউ যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে যাকাত আদায়ের পাশাপাশি আল্লাহর বিধান অমান্য করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য জরিমানাও আদায় করবেন।

তৃতীয়ত : যাকাত আদায় না করে যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখবে, কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তার মালিকের শরীরে সেক দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

"আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে, (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এখন তা জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ করো।" সূরা তাওবা ৯ : ৩৪-৩৫

রাসূল সা. বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে এমন শাস্তি জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"—*সুনানে আবু দাউদ*

চতুর্থত : যারা বিপুলসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর মালিক ছিল, কিন্তু যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ জন্তুগুলোকে তাদের মালিকের কাঁধের ওপর চাপানো হবে। তারা রাসূল সা.-এর কাছে ছুটে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করবে। কিন্তু তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন না। রাসূল সা. বলেছেন, চতুষ্পদ জন্তুর মালিকরা যদি যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে উপুড় করে শোয়ানো হবে। তারপর তার জন্তুগুলোকে পূর্বের চেয়ে বেশি মোটাতাজা করে উপস্থিত করা হবে। জন্তুগুলো তাদের মালিককে শিং দিয়ে গুঁতো দেবে এবং খুর দ্বারা পদদলিত করবে। কোনো জন্তুর শিং বক্র হবে না বা কোনোটা শিংবিহীন হবে না। সর্বশেষ জানোয়ারটি পদদলন করার পর প্রথমটিকে ফিরিয়ে আনা হবে। এভাবে শাস্তি চলতে থাকবে জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা হওয়ার আগপর্যন্ত। সেই দিনটির দৈর্ঘ্য হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। চতুষ্পদ জন্তু মেষ হোক বা উট হোক—যাকাত দেওয়া না হলে পশুমালিককে এমন শাস্তি দেওয়া হবে।—*সুনানে আবু দাউদ*

পঞ্চমত : যারা বিপুল সম্পদের মালিক, অথচ যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ সাপের আকৃতি ধারণ করে তার মালিককে দংশন করবে। রাসূল সা. বলেন, "যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথাওয়ালা সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দুই পার্শ্বে দংশন করে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, তোমার সঞ্চিত ধনভান্ডার।"—*সহিহ বুখারী*

দ্বিতীয় অধ্যায়
যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি

কোনো ব্যক্তির ওপর ইবাদত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত থাকে। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্যও কিছু শর্ত আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু শর্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত; আর যাকাত আর্থিক ইবাদত হওয়ায় সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কিছু শর্তও আছে। নিম্নে উভয় প্রকারের শর্তগুলো উল্লেখ করা হলো—

ক. ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্ত

১. **মুসলিম হওয়া :** যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো মুসলিম হওয়া। রাসূল সা. তাঁর সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামেনে প্রেরণের সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা রক্ষার যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাতে অমুসলিমদের প্রথমে ঈমানের দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঈমান আনার পর তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে সালাত ও যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত পালনের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া যাকাত ইবাদত হওয়ায় তা অমুসলিমের জন্য ফরজ হওয়ার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক।

২. **বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া :** শাফেয়ি, মালিকী ও হাম্বলি মাযহাব মতে, সম্পদশালী শিশুর ওপর যাকাত ফরজ হবে। তার সম্পদ হতে তার ওয়ালী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক যাকাত আদায় করবেন। দলিল হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, "কেউ যদি এতিমের সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পায়, সে যেন তা ফেলে না রেখে ব্যবসায় নিয়োজিত করে। যাতে সাদাকা (যাকাত) দিতে দিতে ঐ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে না যায়।"—*তিরমিযী*

হানাফি মাযহাব মতে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে শিশুর সম্পদে যাকাত নেই। তবে শিশুর মালিকানাধীন জমিতে উৎপন্ন ফসলে উশর ফরজ হবে।

শিশুর সম্পদে যাকাত ফরজ না হওয়ার পক্ষে দলিল হলো রাসূল সা. বলেছেন, "তিন প্রকারের মানুষের ওপর হতে তাকলিফের কলম তুলে নেওয়া হয়েছে : পাগল, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে; ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং শিশু, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।" যেমনিভাবে শিশুর ওপর সালাত ও সাওম ফরজ হয় না, একইভাবে যাকাতও ফরজ হয় না। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, শিশুদের যাকাত পরিশোধ করাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

৩. **বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া :** হানাফি মাযহাব মতে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার শর্ত রয়েছে। তাই পাগলের ওপর যাকাত ফরজ নয়। যুক্তি হিসেবে তাঁরা তিন প্রকারের ব্যক্তির ওপর হতে তাকলিফের কলম তুলে নেওয়ার হাদীসটি উল্লেখ করেন। অন্যান্য মাযহাব মতে, পাগলের ওপর যাকাত ফরজ হবে, তার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক যাকাত আদায় করবেন।

তাকলিফের কলম মানে তার ওপর কোনো ইবাদত বা দায়িত্ব আবশ্যক হওয়ার কলম। যার মাধ্যমে তার ওপর কোনো ইবাদত বা দুনিয়াবি দায়িত্ব ফরজ বা আবশ্যক হয়। যার ওপর শরিয়ার বিধান আবশ্যক হয় তাকে মুকাল্লিফ বলে। আর শরিয়ার বিধান আবশ্যক হওয়া বা প্রযোজ্য হওয়াকে তাকলিফ বলে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া বিধান যেহেতু লিখিত হয়, তাই একে তাকলিফের কলম বলা হয়েছে।

৪. **স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া :** যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকের স্বাধীন হওয়া শর্ত। দাসের ওপর যাকাত ফরজ নয়। বস্তুতপক্ষে দাস কোনো সম্পদের মালিক নয়, তার সব সম্পদের মালিক তার মনিব। তাই তার ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই।

৫. **নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা :** শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদকে নিসাব বলে। যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাই নিসাব। নিসাবের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে দেওয়া হবে। এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, স্বর্ণের নিসাব ২০ দিনার, রুপার নিসাব ২০০ দিরহাম, শস্যের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক, ছাগল বা ভেড়ার নিসাব ৪০টি, গরু ৩০টি এবং উট ৫টি।

৬. **সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা :** যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা ও পূর্ণাঙ্গ দখল থাকতে হবে এবং সম্পদ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় যাকাত ফরজ হবে না। যেমন, জনকল্যাণে ওয়াকফকৃত সম্পদে যাকাত নেই। তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা হলে তার যাকাত দিতে হবে। কোনো মহিলার নামে মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে এখনো আদায় করা হয়নি, তাহলে ঐ মহিলাকে ধার্য মোহরানার ওপর যাকাত দিতে হবে না। কারণ ঐ সম্পদ তার দখলে আসেনি। এ শর্তের প্রয়োগ সরল নয় এবং যাকাত হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ঢালাওভাবে এটির প্রয়োগ কাম্য নয়। তাই কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ উদ্রেক হলে ঐ সম্পদের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৭. **যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত :** কোনো সম্পদের মালিক দুই বা ততোধিক হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের যাকাত দেবেন। যদি প্রত্যেক মালিকের অংশ আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে কাউকে যাকাত দিতে হবে না। আবার কারো অংশ নিসাব পরিমাণ, কারো অংশ নিসাব পরিমাণ নয়, এমন অবস্থা হলে যার অংশ নিসাব পরিমাণ সে যাকাত দেবে। সব মালিকের সম্পদ একত্র করে নিসাব হিসাব করা হবে না। যদি সবার ওপর বা একাধিক অংশীদারের ওপর যাকাত ফরজ হয়, তারা চাইলে একত্রে যাকাত আদায় করতে পারেন, আবার আলাদাভাবেও আদায় করতে পারেন।

৮. **হারাম সম্পদের যাকাত :** এটি সম্পদের মালিকানাসংক্রান্ত বিষয়ের প্রশ্ন। হারাম সম্পদ বলতে বোঝায় অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ। চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, রাহাজানি, অবৈধ ব্যবসা ইত্যাদি নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ সম্পদ বলে গণ্য। হারাম পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তি ঐ সম্পদের মালিক নয়। অতএব, তা খরচের অধিকারো তার নেই। যাকাত প্রদানও একধরনের খরচ। তাই ফকিহগণ বলেন, হারাম সম্পদ হতে যাকাত দেওয়া যাবে না। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সমুদয় সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। যদি প্রকৃত মালিক চিহ্নিত করা সম্ভব না হয় তাহলে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে পুরো সম্পদ গরিব-মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে।

খ. সম্পদের ক্ষেত্রে শর্ত

১. **সম্পদ বর্ধনযোগ্য হওয়া :** যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ বর্ধনযোগ্য হওয়া শর্ত। এটি বাস্তবেও হতে পারে, আবার ধারণাগতভাবেও হতে পারে। সম্পদ বর্ধনশীল না হলে তার ওপর যাকাত ফরজ নয়। যাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রকে সহযোগিতা এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। কিন্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ চান না যে, যাকাত আদায় করে ধনী ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে যাক। সম্পদ যদি বর্ধনশীল না হয় এবং তা হতে বছরের পর বছর যাকাত আদায় করা হতে থাকে, তাহলে ধনী ব্যক্তি একসময় দরিদ্র হয়ে যাবে। তাই যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া অপরিহার্য।

   কিছু সম্পদে বর্ধনশীলতার বিষয়টি দৃশ্যমান; যেমন, প্রজননের মাধ্যমে চতুষ্পদ জন্তু বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত ফসল তো বর্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যবসা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে নগদ অর্থ বেড়ে যায়। স্বর্ণ-রুপা বাহ্যিকভাবে না বাড়লেও মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে এগুলো বর্ধনশীলতা প্রকাশ পায়। এ শর্তের কারণে পরিধেয় পোশাক, ঘরের আসবাবপত্র, দোকানপাট, জমিজমা ও বইপত্রের ওপর যাকাত ফরজ হয় না। একইভাবে চাষাবাদ ও আরোহণের জন্তুর ওপরও যাকাত ফরজ হয় না। বর্তমান বাস্তবতায় ব্যবসা-পরিবহন ছাড়া ব্যক্তিগত চলাচলের গাড়ির (যত দামিই হোক না কেন) ওপর যাকাত বর্তাবে না।

২. **সম্পদ এক বছর অধিকারে থাকা :** যাকাত ফরজ হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, মালিকের অধিকারে সম্পদ এক চন্দ্রবছর থাকা। কোনো সম্পদ যদি এক বছরের কম সময়ে হাতে থাকে, তবে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। এ শর্তটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রুপা, চতুষ্পদ জন্তু ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল সা. বলেছেন, "এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো সম্পদে যাকাত নেই।"—*সুনানে আবু দাউদ*

   তবে জমিতে উৎপন্ন শস্যের ক্ষেত্রে এক চন্দ্রবছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই, প্রতিবার ফসল তোলার পরই উশর দিতে হবে। কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপন্ন শস্যের যাকাত প্রদানে ফসল কাটার পর বিলম্ব করতে নেই, وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ "ফল-ফসল সংগ্রহের দিন সেগুলোর হক দিয়ে দাও।" সূরা আনআম, ৬ : ১৪১

জমিতে ফসল উৎপন্ন হওয়াটাই একধরনের প্রবৃদ্ধি। তা ছাড়া ফসল জমা করে রাখলে দিনে দিনে তা কমে যায়, তাই বৃদ্ধি লাভের জন্য বছর অতিক্রান্ত করা নিরর্থক। উৎপাদিত ফসলে একবারই যাকাত ফরজ হয়। উশর আদায়ের পর কেউ যদি অবশিষ্ট শস্য গোলায় পাঁচ বছরও রাখে তার দ্বিতীয়বার যাকাত দিতে হবে না।—*মাওসুআ ২৩ : ২৪২; কারযাভী*

অনুরূপভাবে চতুষ্পদ প্রাণীর বাচ্চার যাকাত বিধান হলো, হিজরি বছরের মধ্যবর্তী সময়ে যদি কোনো পশু বাচ্চা জন্ম দেয়, সেই বাচ্চা নিসাবের সাথে যোগ হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে। অপরদিকে, বছরের মাঝখানে অর্জিত ব্যবসার মুনাফা মূলধনের সাথে যোগ হবে, যদিও মুনাফার ওপর এক বছর পূর্ণ না হয়। উল্লেখ্য, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য যেসব সম্পদে হিজরি এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয় তার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে আছে।

৩. **সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া :** হানাফি মাযহাবের আলেমগণ যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত একটি শর্তারোপ করেন, সেটি হলো—যাকাতযোগ্য সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হয় না। যে ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নেই, তাকে ধনী বলা যায় না। আর যাকাত ফরজ করা হয়েছে ধনীদের ওপর। রাসূল সা. যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে মুয়ায রা.-কে বলেছিলেন, "এটি ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতে হবে।"

মৌলিক প্রয়োজনের শর্তের সুযোগসন্ধানী প্রয়োগ কাম্য নয়। বর্তমান যুগে বিলাসিতার অনেক উপকরণকে কেউ কেউ মৌলিক প্রয়োজন বানিয়ে নিয়েছে। তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মৌলিক প্রয়োজন বলতে এমন কিছু বোঝায়, যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, যেমন : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি।

৪. **ঋণমুক্ত হওয়া :** যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ ঋণমুক্ত হওয়া শর্ত। ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে কারো যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কর্তব্য হলো সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করা। যাকাতকে দরিদ্রের হক বলা হয়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদের প্রথম হকদার হলো পাওনাদার। তাই প্রথমে ঋণ আদায় করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। রাসূল সা. বলেছেন, "কারো ওপর ঋণ থাকলে সে যেন প্রথমে তা শোধ করে, তারপর বাকি সম্পদের যাকাত আদায় করবে।"—*মালেক মুয়াত্তা*

যারা মাসিক/বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের জন্য চুক্তিবদ্ধ তারা কেবল এক বছরের কিস্তির সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদের ওপর যাকাত হিসাব করবেন। এক্ষেত্রে ঋণের সম্পূর্ণ পরিমাণ ধর্তব্য হবে না।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তের সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয়

- **মৃত ব্যক্তির যাকাত :** বিষয়টি মালিকানার শর্তের সাথে সম্পর্কিত। কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরজ হয়েছে, কিন্তু তিনি তা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ হতে ওয়ারিশগণ বা সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক যাকাত আদায় করবে। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে—ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার সম্পদের মালিকানা ওয়ারিশদের কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবুও কেন তার ওপর যাকাত ফরজ হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের পূর্বে তার ঋণ আদায় করতে হয়। যাকাত হলো আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ; মানুষের ঋণ আদায়ের চেয়ে আল্লাহর ঋণ আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাকাত ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

- **বহির্বিশ্বে রক্ষিত সম্পদের যাকাত :** কারো সম্পদ যদি বিদেশের ব্যাংকে থাকে কিংবা কেউ যদি বিদেশে ব্যবসা করেন এবং ঐ সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হয়, তাহলে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। বিদেশে শরিয়াহ নির্ধারিত খাতে যাকাত বণ্টন করার সুযোগ থাকলে তিনি সেখানে বণ্টন করতে পারবেন, অন্যথায় নিজ দেশে যাকাত আদায় করবেন। তবে বিদেশে যাকাত আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ দেশে যাকাত আদায় করতে পারবেন, যদি সেখানে যাকাতের হকদার মানুষ বেশি থাকে। আবার সম্পদ দেশে, সম্পদের মালিক বিদেশে—এমন ক্ষেত্রেও তার সম্পদের যাকাত দিতে হবে। দেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন বা প্রতিনিধি তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবেন।

- **কয়েদি বা সাজাপ্রাপ্ত আসামীর যাকাত :** কারাদণ্ড বা বন্দিদশা যাকাত রহিত করে না। কারাবন্দি হাজতি হোক বা সাজাপ্রাপ্ত, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। তার পক্ষ হতে তার পরিবারের সদস্য বা তার সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক যাকাত আদায় করবেন। যদি তা না করা হয় কারাবন্দির ওপর থেকে যাকাত রহিত হবে না। মুক্তিলাভের পর পূর্বের বছরগুলোর যাকাত তাকে হিসাব করে আদায় করতে হবে।

- **মুসাফিরের যাকাত :** সফরের কারণেও যাকাতের বিধান রহিত হয় না। মুসাফির ব্যক্তি যদি নিজ দেশে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন, তাহলে ঐ সম্পদের যাকাত দিতে হবে। ঐ ব্যক্তির দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে তার পক্ষ থেকে তার আত্মীয় স্বজন বা প্রতিনিধি যাকাত আদায় করবেন। এটা সত্য যে, সম্পদশালী মুসাফিরও যদি বিদেশে বিপদগ্রস্ত হন, তাহলে তিনি যাকাত গ্রহণ করতে পারেন। তাই বলে এ বিধানের ফলে দেশে রক্ষিত সম্পদের ওপর যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও নিসাব

নিসাব কী?

নিসাব মানে পরিমাণ বা সংখ্যা। ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে নিসাব বলা হয়। কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই তার ওপর যাকাত ফরজ হয়। ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না।

যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে

যাকাত প্রযোজ্য হয় এমন প্রধান প্রধান সম্পদগুলো হলো—ক. সোন-রুপা, খ. গবাদি পশু গ. নগদ টাকা, ঘ. ব্যবসায়িক পণ্য, ঙ. ফল ও ফসল চ. খনিজ সম্পদ। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো :

১) **সোনা-রুপা :** সোনার নিসাব ২০ দিনার বা পরিমাপের হিসাবে ৮৫ গ্রাম বা ৭.২৯ তোলা। আর রুপার নিসাব নিসাব ২০০ দিরহাম বা ৫৯৫ গ্রাম বা ৫১.০২ তোলা। গয়নার যাকাতের ব্যাপারে উলামাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেন, দেখতে হবে সোনা-রুপার গয়না ব্যবহারের জন্য, নাকি সঞ্চয় করে রাখার জন্য, নাকি ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজের জন্য। অধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে—নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপার ওপর হিজরি এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, যে উদ্দেশ্যেই তা সংগ্রহ করা হোক না কেন। সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব বস্তু যেমন হীরা, মুক্তা, ইয়াকুত, মোতি, মুক্তাদানা, গোমেদ-পীতবর্ণ মণিবিশেষ ইত্যাদির গয়নার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না; তার মূল্য যা-ই হোক না কেন। তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসায় পণ্য হিসেবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২) **ব্যাংক নোট** : ব্যাংক নোট তথা ডলার, পাউন্ড, ইউরো, রিয়াল টাকা ইত্যাদি মুদ্রা, যা নগদ অর্থ হিসেবে পরিচিত তার ওপর যাকাত আসবে। একইভাবে অর্থের অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট যেমন : চেক, বিল, বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র যার বৈষয়িক মূল্য রয়েছে, তার ওপরও যাকাত ফরজ হবে। সোনা বা রুপার নিসাবের মূল্যের হিসাবে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩) **ব্যবসায় পণ্য :** যেসব পণ্য বা বস্তু দিয়ে ব্যবসা করা হয়, যেমন : ব্যবসার নানা পণ্য, জমি, গাড়ি ও ব্যবসার অন্যান্য সামগ্রী, যা কেনাবেচা করা হয়। অধিকাংশ আলেম মনে করেন, ব্যবসায় পণ্যে যাকাত ওয়াজিব।

৪) **গবাদি পশু :** উট, গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়া-দুম্বার ওপর যাকাত ফরজ। গৃহপালিত পাখি, মুরগি, ঘোড়া, গাধা, খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণীতে যাকাত নেই, তার সংখ্যা যত বেশি হোক। তবে এসবের কোনো প্রাণী ব্যবসার জন্য নির্ধারিত হলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। উটের নিসাব ৫টি, গরু-মহিষের নিসাব ৩০টি, ছাগল-ভেড়া-দুম্বার নিসাব ৪০টি।

৫) **ফল ও ফসল :** হাদীসে গম, যব, খেজুর ও কিশমিশের নাম উল্লেখ করে যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ চার প্রকার ব্যতীত যেসব ফল ও ফসল খাদ্য ও সঞ্চয় করার উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করলে নষ্ট হয় না, যেমন : ভুট্টা, ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, তাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে শাকসবজি ও পচনশীল শস্যের ওপর যাকাত নেই। ফল ও ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। ফসল সংগ্রহের দিন প্রাকৃতিক রিসোর্স ব্যবহার করা হলে এক-দশমাংশ এবং সেচ বা কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে তার অর্ধেক যাকাত আদায় করতে হয়। ফল ও ফসলের নিসাব ৫ ওয়াসাক বা ২৫ মণ মতান্তরে ১৭ মণ।

চতুর্থ অধ্যায়
সোনা ও রুপার যাকাত

যাকাতের নিসাবের আলোচনায় ফিকহের গ্রন্থগুলোতে সোনা ও রুপার নিসাবের আলোচনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এ দুই ধাতুর নিসাব প্রায়শ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেকালে যখন যাকাতের নিসাব নির্ধারিত হতো তখন কাগজি মুদ্রার প্রচলন ছিল না, বরং স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। ধনী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণত গরিবদের কাছে কোনো মুদ্রাই থাকত না। তারা সাধারণত পণ্য বিনিময় প্রথার মাধ্যমে লেনদেন করতেন। তাই সে সময় প্রাণীসম্পদ তথা চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষিজ সম্পদ তথা উৎপন্ন ফসলের নিসাব পৃথকভাবে এবং মুদ্রা হিসেবে সোনা ও রুপার নিসাব নির্ধারণ করা হতো। পরবর্তীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলনের পর ফকিহগণ সোনা ও রুপার বাজারদরের ওপর ভিত্তি করে নগদ অর্থের নিসাব নির্ধারণ করেন। তা ছাড়া যেসব পণ্যের নিসাব নির্ধারিত নেই, সেগুলোর নিসাবও সোনা বা রুপার নিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তাই সোনা ও রুপার নিসাবের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

সোনা ও রুপার যাকাত

সোনা ও রুপা প্রধানতম সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। সোনা-রুপার অপ্রতুলতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি এ দুটি ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি করেছে ও দ্রব্যমূল্যের মান হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ বলেন–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

"যারা সোনা ও রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে আর বলা হবে, এটাই তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন করো।" সূরা তাওবা, ৯ : ৩৪-৩৫

রাসূল সা. বলেছেন, "প্রত্যেক সোনা ও রুপার মালিক, যে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। তা ঠান্ডা হয়ে গেলে পুনরায় তাকে গরম করা হবে এবং দাগ দেওয়া অব্যাহত থাকবে। সেদিনের পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। তাদের বিচার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত এ শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর সে জান্নাত কিংবা জাহান্নামের পথ ধরবে।"—*সংক্ষেপিত, সহিহ মুসলিম*

সোনার নিসাব

রাসূল সা. বলেছেন, "২০ দিনারের কম পরিমাণ সোনায় যাকাত ফরজ নয়। যদি কোনো ব্যক্তির নিকট ২০ দিনার পরিমাণ সোনা এক বছর যাবৎ থাকে, তবে এর জন্য অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে...।"—*সুনানে আবু দাউদ*

উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত ১ দিনার সমান ৪.২৫ গ্রাম সোনা। অতএব, ২০ দিনার সমান ২০×৪.২৫=৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। এক ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হলে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণে (৮৫÷১১.৬৬) ৭.২৯ ভরি স্বর্ণ। অর্থাৎ কারো নিকটে উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকলে তার ওপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত দেওয়া ফরজ।

সোনার যাকাত দেওয়ার নিয়ম

ব্যক্তির মালিকানায় যে ক্যারেটের সোনা রয়েছে, সে ক্যারেটের প্রতি গ্রাম সোনার বাজারদর জানতে হবে। যদি একাধিক ক্যারেটের সোনা থাকে, তবে অধিক পরিমাণ সোনা থাকলে প্রত্যেক ক্যারেটের মূল্য আলাদা করে জানতে হবে; আর পরিমাণ কম হলে যে ক্যারেটের বেশি আছে তার বাজারদর জানতে হবে; অতঃপর এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্যকে তার নিকট যে কয় গ্রাম সোনা আছে, তার সংখ্যা দিয়ে গুণ দিতে হবে। এভাবে সোনার গ্রামকে মুদ্রায় পরিণত করে মূল্যের ২.৫% যাকাত হিসেবে বের করতে হবে। এটিই সোনার যাকাত।

যেমন : কেউ ২১ ক্যারেট ১০০ গ্রাম সোনার মালিক, সে তার যাকাত বের করার জন্য প্রথম ২১ ক্যারেট সোনার বাজার দর জানবে। যদি এক গ্রামের দাম হয় ১০,০০০ টাকা হয়, তবে যাকাতের হিসাব নিম্নরূপ হবে : ১০০ (গ্রাম স্বর্ণ)* ১০,০০০ (টাকা, যা এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্য)* ২.৫% (যাকাত) অর্থাৎ ১০০*১০,০০০* ২.৫%=২৫০০০ টাকা।

রুপার নিসাব

রুপার নিসাব উল্লেখ করে রাসূল সা. বলেছেন, "পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই।"—*সহিহ বুখারী*

উল্লেখ্য, ১ উকিয়া সমান ৪০ দিরহাম, আর ৫ উকিয়া হলো ৪০×৫=২০০ দিরহাম। অন্যত্র রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর কিছুই ফরজ নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে ৫ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী প্রদান করতে হবে।"—*সুনানে আবু দাউদ*

হাদীসে বর্ণিত ২০০ দিরহাম সমান ৫৯৫ গ্রাম রুপা। ১১.৬৬ গ্রাম সমান ১ ভরি হলে ৫৯৫ গ্রাম রুপা হবে ৫৯৫÷১১.৬৬=৫১.০২ ভরি। উক্ত পরিমাণ রুপা কারো নিকট এক বছর যাবৎ থাকলে তার ওপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫% যাকাত আদায় করা ফরজ।

রুপার যাকাত নির্ণয় করার নিয়ম

যে ক্যারেট রুপা তার কাছে রয়েছে, প্রথম তার বাজারদর জানতে হবে। আর যদি একাধিক ক্যারেটের রুপা থাকে, তবে যে ক্যারেট বেশি রয়েছে তার বাজারদর জানতে হবে। অতঃপর যত গ্রাম রুপা তার মালিকানায় রয়েছে, তার সংখ্যা দিয়ে এক গ্রাম রুপার বাজারদরকে গুণ দিতে হবে। আর তার ২.৫% হবে সে রুপার যাকাত।

যেমন : কেউ ৬০০ গ্রাম ৮০ ক্যারেট রুপার মালিক। সে যখন তার যাকাত বের করার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে এক গ্রাম ৮০ ক্যারেট রুপার বাজারদর জানবে। ধরুন, এক গ্রাম রুপার মূল্য ১০০ টাকা হলে নিম্নের নিয়মে যাকাত বের করতে হবে : ৬০০ (গ্রাম-রুপা)* ১০০ (টাকা, যা এক গ্রাম রুপার মূল্য)* ২.৫% = ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ এক গ্রাম রুপার মূল্য যদি হয় ১০০ টাকা, ৬০০ গ্রাম রুপার যাকাত আসবে ১৫০০ টাকা।

সোনা ও রুপা একত্রিত করে যাকাত প্রদান

সোনা ও রুপা উভয়টি মিলে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাতযোগ্যতা

কারো নিকটে সোনা ও রুপা আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ নেই। কিন্তু উভয়টি মিলে নিসাব পরিমাণ হয়। এক্ষেত্রে তার ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রণিধানযোগ্য মত হলো, সোনা ও রুপা ভিন্ন দুটি বস্তু। একটি অপরটির নিসাব পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ দুটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত ফরজ নয়।

অপর একদল আলেম মনে করেন, যেহেতু যাকাত গরিবের হক এবং সোনা ও রুপার মূল্যের ব্যবধানও এখন অনেক বেশি। ফলে দেখা যাবে, কারো কাছে সঞ্চিত সোনা ও রুপা উভয়টির দাম অপর কারো নিকট শুধু সঞ্চিত সোনা বা রুপার চেয়ে বেশি হওয়ার পরেও তার ওপর যাকাত ধার্য হচ্ছে না। আর সোনা ও রুপা এখন বিনিময় মুদ্রা হিসেবেও নেই; বরং তা ব্যবহার বা সঞ্চয়ের জন্যেই রাখা হয়। তাই তারা মনে করেন, যদি সোনা ও রুপা উভয়টির মূল্যমান নগদ অর্থে হিসাব করলে এককভাবে সোনা বা রুপার যাকাতের নিসাব সমান হয়ে যায়, তবে তার ওপর যাকাত আবশ্যক হবে।

সোনা ও রুপা উভয়টির মিলিত যাকাতের হিসাব

যেমন, কারো নিকট ৩৪০ গ্রাম রুপা ও ৫৭ গ্রাম সোনা রয়েছে। সোনা বা রুপার কোনোটিই এককভাবে নিসাব পরিমাণ নয়। তার নিকট থাকা রুপা নিসাব পরিমাণ ৫৯৫ গ্রাম হতে ২৫৫ গ্রাম কম। আবার সোনা আছে ৫৭ গ্রাম; যা নিসাব পরিমাণ ৮৫ গ্রাম হতে ২৮ গ্রাম কম। এখন তার কাছে থাকা ৫৭ গ্রাম সোনার দামে যদি ২৫৫ গ্রাম রুপা ক্রয় করা যায়; অথবা ৩৪০ গ্রাম রুপার দামে যদি ২৮ গ্রাম সোনা ক্রয় করা যায়, তবে তার সম্পদ নিসাব পরিমাণ বলে গণ্য হবে এবং তার ওপর বছরান্তে যাকাত ফরজ হবে।

সোনা ও রুপার সাথে নগদ অর্থের যাকাত

কেউ যদি নগদ অর্থের মালিক হয়, আর তার সোনা-রুপা ও ব্যবসায় পণ্য মিলে নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার ওপর যাকাত ফরজ। কারণ, এগুলোর একটি অপরটির প্রতিনিধিত্ব করে। এমন হলে সোনাকে টাকার অঙ্কে নিয়ে আসবে, অতঃপর নগদ অর্থ ও সোনার মূল্য হিসাব করবে, যদি নিসাব পরিমাণ হয় উভয়ের যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ হিজরি এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করবে।

একাধিক মালিকানায় নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপা থাকলে যাকাত ফরজ হয়?

কোনো পরিবারে একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় কিছু সোনা-রুপা রয়েছে। পৃথকভাবে কারো নিসাবই পূর্ণ হয় না। কিন্তু তাদের সকলের সোনা-রুপা একত্র করলে নিসাব পরিমাণ হয়। যেমন : মায়ের ৫ ভরি ও মেয়ের ৪ ভরি সোনা রয়েছে; যা আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ নয়। কিন্তু একত্রে নিসাব পরিমাণ হয়। এমতাবস্থায় তাদের ওপর যাকাত ফরজ হবে না। কেননা, যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত হলো—ব্যক্তিকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে হবে। রাসূল সা. বলেছেন, "সোনা ও রুপার মালিকরা যারা তদের হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে।"—*সহিহ মুসলিম*

এখানে মালিক বলতে ব্যক্তিমালিকানাকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, ব্যক্তিমালিকানায় নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপা থাকলেই কেবল যাকাত ফরজ; অন্যথায় ফরজ নয়।

ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত অলংকারের যাকাত

যে সোনা ব্যবসার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তার ওপর যাকাত ফরজ। হারাম কাজে ব্যবহৃত সোনা, যেমন পুরুষের ব্যবহৃত সোনা এবং কোনো প্রাণীর আকৃতিতে বানানো নারীর অলংকার, যা ব্যবহার করা হারাম—এরূপ ব্যবহৃত সোনারও যাকাত ফরজ। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ, সোনার এরূপ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। তবে হালাল পন্থায় এবং নারীর ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরজ কি না, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরজ। হাদীসে এসেছে, আমর ইবনে শুআইব রা. বর্ণনা করেন যে, "এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূল সা.-এর নিকটে এলেন। তার কন্যার হাতে মোটা দুটি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূল সা. তাকে বললেন, 'তুমি কি এর যাকাত দাও?' মহিলাটি বললেন, 'না।' তখন রাসূল সা. বললেন, 'তুমি কি পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের বালা পরিধান করাবেন?' রাবী বলেন, এ কথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবি সা.-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, 'এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য'।"—*সুনানে আবু দাউদ*

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, "এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অলংকারের যাকাত দিতে হবে কি?" তিনি বললেন, "যদি তা দুইশত দিরহামে পৌঁছে, তাহলে তার যাকাত আদায় করবে।" মহিলাটি বললেন, "আমার ঘরে কতিপয় এতিম রয়েছে, তাদেরকে কি (যাকাত) প্রদান করতে পারব?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" এ সকল হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ ও রুপা নিসাব পরিমাণ হলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

অলংকারের মান নির্ধারণ

কোনো অলংকারের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ অলংকারের মধ্যে যে ধাতবের পরিমাণ তদন্তগত অন্য সব ধাতবের চেয়ে পরিমাণে বেশি, তদনুরূপ প্রধান ধাতবের মানকেই বিবেচনা করা হয়। উদাহরণত, কোনো অলংকারে ৫৫% সোনা ও ৪৫% তামা থাকলে ঐ অলংকারটি স্বর্ণনির্মিত বলে গণ্য হবে এবং সেই মোতাবেক অলংকারটির জন্য যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে, কোনো অলংকার নির্মাণে ৫০ শতাংশের বেশি তামা ও ৫০ শতাংশের কম সোনা ব্যবহৃত হলে ঐ অলংকারের জন্য কোনো যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ, এ রকম ক্ষেত্রে অলংকারটি তাম্রনির্মিত বলে গণ্য হবে, স্বর্ণনির্মিত নয়।

হীরা-মুক্তাসহ মূল্যবান পাথর ইত্যাদির যাকাত

সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব বস্তু, যেমন : হীরা, মুক্তা, ইয়াকুত, মোতি, মুক্তোদানা, গোমেদ-পীতবর্ণ মণিবিশেষ ইত্যাদি বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না; তার মূল্য যা-ই হোক, তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
নগদ অর্থ বা মুদ্রার যাকাত

নগদ অর্থের যাকাত

প্রাথমিক যুগের মানুষ নগদ অর্থ বলতে কিছুই জানত না। তারা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন করত। অতঃপর ধীরে ধীরে নগদ অর্থের ব্যবহার শুরু হয়। সাথে সাথে সোনা ও রুপা মূল্যবান বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়। রাসূল সা.-এর সময় আরব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করত। সোনা দিয়ে তৈরি হতো দিনার, আর রুপা দিয়ে তৈরি হতো দিরহাম। কিন্তু তা ছোট ও বড় হওয়ায় ওজনের তারতম্য হতো। এ কারণে জাহেলি যুগে মক্কার লোকেরা তা গণনার ভিত্তিতে ব্যবহার না করে ওজনের ভিত্তিতে ব্যবহার করত। মূলত এ কারণেই স্বর্ণ ও রুপার নিসাব যথাক্রমে ২০ দিনার ও ২০০ দিরহামকে ওজনের ভিত্তিতে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রুপা ধার্য করা হয়েছে।

ব্যাংক নোটের যাকাত

বর্তমান সময়ে আর সোনা ও রুপার বিনিময়ে লেনদেন কোথাও প্রচলিত নেই। এখন আছে ব্যাংক নোট। যেমন : ডলার, পাউন্ড, রিয়াল ইত্যাদি। ব্যাংক নোটই বর্তমান সময়ে নগদ অর্থ হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে অর্থের বিভিন্ন দলিল—চেক, বিল, বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্রের বৈষয়িক মূল্য রয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যাংক নোট ও চেক মূলত তার মূল্যের দলিল। অতএব, তার মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং হিজরি এক বছর পূর্ণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। প্রতি হাজারে ২৫ টাকা যাকাত দিতে হবে।

নগদ অর্থের নিসাব

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন করছে। দিরহাম, দিনার, ডলার, টাকা যা-ই হোক না কেন, তা যদি সোনা বা রুপার নিসাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ মুদ্রার ওপর এক বৎসর সময়কাল অতিবাহিত হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরজ।

রাসূল সা.-এর জামানায় ১ দিনার সমান ১০ দিরহাম হতো; ২০ দিনার সোনা ও ২০০ দিরহাম রুপার মান সমান ছিল। এ কারণে রাসূল সা. সোনা ও রুপার নিসাব যথাক্রমে ২০ দিনার ও ২০০ দিরহাম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে উল্লিখিত পরিমাণ সোনা ও রুপার মানে বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা কি নগদ অর্থের নিসাব সোনার মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করব, না রুপার মূল্যের ভিত্তিতে?

এ ব্যাপারে উলামাদের দুটি মত—

এক. সোনার মূল্যের ভিত্তিতে। তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, তখন সোনা ও রুপা দুটোই মূল্যের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এখন রুপা তার মূল্যমান হারিয়ে ফেলেছে। সোনার সাথে অন্যান্য জিনিস ও আন্তর্জাতিক মুদ্রার মান খুবই প্রাসঙ্গিক। মুদ্রার ট্রানজেকশন রেট ও সোনার দাম একইভাবে বাড়ে ও কমে। তা ছাড়া অন্যান্য জিনিসের নিসাব যেমন, গবাদি পশুর নিসাব হিসাব করলে সোনার নিসাবের কাছাকাছি হয়ে থাকে। তারা দুটি নিসাব তথা সোনার নিসাব ও রুপার নিসাব থেকে কোনো একটি বেছে নেওয়াকে উৎসাহিত করেন না। কারণ দামের পার্থক্য বিস্তর; প্রায় ১০:১। এটা তো বলা যায় না যে, সোনার হিসাবে যাকাত ৮ লাখ টাকা আর রুপার হিসেবে ৮০ হাজার টাকা। অঙ্কটা কাছাকাছি হলে এটা বলা যুক্তিযুক্ত ছিল।

দুই. রুপার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাতের নিসাব হিসাব করতে হবে। তারা নিজেদের মতের পক্ষে আকলি দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, যাকাত যেহেতু গরিবের অধিকার; আর রুপার হিসেবে গরিব বেশি লাভবান হয় এবং ইসলামের ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে অবহেলা না করে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি; তাই রুপার নিসাবই ধর্তব্য হবে। অন্যথায় গরিব বঞ্চিত হতে পারে কিংবা যাকাত অনাদায়ী থেকে যাবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। দুটি মতই গ্রহণযোগ্য আলেমদের। আল্লাহ যার হৃদয়কে যেদিকে ঠেলে দেন, সে মত গ্রহণ করবে।

মুদ্রার যাকাত বের করার পদ্ধতি

মুদ্রার যাকাত ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা ২.৫০% যাকাত দিতে হবে। যেমন, কারো নিকট ৪,০০,০০০/= টাকা রয়েছে। উক্ত টাকার যাকাত বের করার নিয়ম হলো—৪,০০,০০০÷৪০ =১০,০০০/= টাকা।

উল্লেখ্য, কয়েকটি কারণে রুপাকে নিসাবের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম—

- নিসাব পরিমাণ রুপার মূল্য নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ অপেক্ষা অনেক কম। এমতাবস্থায় সতর্কতা ও দায়মুক্তির বিবেচনায় রুপার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত প্রদান করা যুক্তিসংগত।

- নিসাব পরিমাণ রুপার মূল্যকে টাকার যাকাতের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হলে গরিবরা উপকৃত হয়। রুপার নিসাবে যে পরিমাণ লোকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, স্বর্ণের নিসাবে সে পরিমাণ লোকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। অতএব, রুপার নিসাবে যাকাত দানকারীর সংখ্যা বাড়বে আর গরিবরা উপকৃত হবে।

অতএব, সাহিবে নিসাব যদি রুপার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত দেয়, প্রথম রুপার বাজারদর জানবে। এক্ষেত্রে ৮০ ক্যারেটকে প্রধান্য দেবে। কারণ, এটাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। অতঃপর এক গ্রাম রুপার মূল্যকে ৫৯৫ দিয়ে গুণ করলে যে অঙ্ক আসবে, সেটিই রুপার হিসাবে নিসাব।

আর যদি দ্বিতীয় ফতোয়া মোতাবেক সোনাকে নিসাবের মানদণ্ড মানা হয়, তবে ২১ ক্যারেট সোনার বাজারদর জানবে। কারণ, এ ক্যারেট সোনা সবার নিকট পরিচিত ও সচরাচর আদান-প্রদান করা হয়। আর প্রতিগ্রাম সোনার ৮৫ গুণকে নিসাব হিসেবে গণ্য করবে। যদি কারো সোনা-রুপার মূল্য ও নগদ অর্থ এ পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তার ওপর দ্বিতীয় ফতোয়া মোতাবেক যাকাত ওয়াজিব হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রদত্ত ঋণের যাকাত

ঋণের যাকাত

ঋণের যাকাত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উলামায়ে কেরাম ঋণকে বহুভাগে বিভক্ত করেছেন। ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা বিবেচনায় ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—শক্তিশালী, মধ্যম ও দুর্বল ঋণ। ফেরত পাওয়ার মেয়াদের বিবেচনায় ঋণ ২ প্রকার—ক্ষণস্থায়ী ঋণ ও দীর্ঘস্থায়ী ঋণ। ব্যবহারের দিক বিবেচনায় ২ প্রকার–ব্যক্তিগত ব্যবহার ও শিল্প ঋণ। প্রকারের ভিন্নতায় ঋণের যাকাতের বিধানেরও ভিন্নতা রয়েছে। প্রশ্ন হলো যিনি অন্যকে ঋণ প্রদান করেছেন এবং যিনি ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং এক চন্দ্রবছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের ওপর যাকাত ফরজ হবে কি?

যদিও আলেমদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ঋণের ওপর যাকাত নেই। কিন্তু বিষয়টা এমন নয় যে, কোনো ঋণেই যাকাত নেই। কোন ঋণে যাকাত নেই এবং কোন ঋণের যাকাত আছে, নিম্নে কিছু মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হলো—

ঋণদাতার যাকাতের বিধান

ঋণদাতা নিম্নোক্ত শর্ত মোতাবেক নিসাব ও বর্ষপূর্তি সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের যাকাত আলাদা অথবা যাকাতযোগ্য অন্যান্য অর্থের সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করবেন—

১. ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ সন্দেহাতীতভাবে যাকাতবর্ষের মধ্যেই ফেরত পাবেন অথবা নিশ্চিতভাবেই কিছুদিনের মধ্যে ফেরত পাচ্ছেন; যাকাত হিসাবের সময় তা পাওয়া না গেলও সেই ঋণের অর্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনায় এসেছে, "আপনার যেসব ঋণ ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন, বছরপূর্তিতে আপনার ওপর তার যাকাত প্রযোজ্য হবে।"—*ইসলামের যাকাত বিধান*, ইউসুফ আল কারযাভী

২. ঋণদাতা ঋণের অর্থ শীঘ্র ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে বটে; কিন্তু কবে, কখন ফেরত পাবেন তা নিশ্চিত নয়। যেমন, দেনাদার ঋণ স্বীকার করছে, ভবিষ্যতে অস্বীকার করার সম্ভাবনা নেই এবং তার থেকে উসুল করাও সম্ভব। এমন হলে তিনি অর্থ ফেরত না পেলেও নিসাব পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে প্রতি বছর বছরান্তে ঋণপ্রদত্ত অর্থের যাকাত দিয়ে যাবেন। আর যদি ঋণের অর্থের যাকাত দেওয়ার মতো সামর্থ্য তার না থাকে, তবে ঋণপ্রদত্ত অর্থ ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরসমূহের যাকাত হিসাব করে দিয়ে দেবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করল এবং সে তা ফেরত পাবে বলে নিশ্চিত, তাহলে তার ওপর ঋণের যাকাত দেওয়া আবশ্যক।" আলী রা. বলেন, "যদি তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে ঋণের অর্থ ফেরত পাবার পর বিগত বছরসমূহের যাকাত প্রদান করবেন।" উসমান রা. বলেন, "যে ঋণের অর্থ আপনি চাইলে ঋণগ্রহীতা থেকে ফেরত নিতে পারেন এবং ঋণগ্রহীতাও তা ফেরত দিতে সক্ষম; তবে লজ্জায় বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে তা ফেরত চাচ্ছেন না, তাহলে আপনি সেই ঋণের যাকাত প্রদান করবেন।"—*ইসলামের যাকাত বিধান*, ইউসুফ আল কারযাভী

৩. যদি ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, যেমন দেনাদার ঋণ অস্বীকার করছেন অথবা তিনি গরিব, ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য তার নেই অথবা ঋণ নিয়ে টালবাহানা করছেন, এসব ক্ষেত্রে ঋণের অর্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। কারণ, ঋণ তার পূর্ণ আয়ত্তে নেই এবং সে তাতে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে না। তবে ভবিষ্যতে কখনো ঋণের অর্থ ফেরত পেলে ওই বছরের যাকাত প্রদান করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, "তোমরা বছরপূর্তিতে তোমাদের সম্পদের যাকাত দাও। যে ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে তার যাকাত দাও। আর যদি সন্দেহপূর্ণ ঋণ হয়, তবে ঋণগ্রহীতা ফেরত দেওয়ার পূর্বে তার যাকাত দিতে হবে না।"—*ইসলামের যাকাত বিধান, ইউসুফ আল কারযাভী*

তেমনিভাবে, মানুষের নিকট যাদের বকেয়া রয়েছে, যেমন বকেয়া দেনমোহর, যা স্বামী এখনও স্ত্রীকে প্রদান করেনি, কাস্টমারের নিকট থাকা দোকানির অবশিষ্ট কিস্তি, এ ছাড়া অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ওপরও যাকাত নেই, যতক্ষণ না মালিক তা হস্তগত করবে। হাতে পাওয়ার পর থেকে যখন এক বছর পূর্ণ হবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে চুরি যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, তার ওপর মালিকের পুরোপুরি কর্তৃত্ব নেই। তবে সম্পদ ফেরত পাওয়ার পর নিসাব ও বছর পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে তার ওপর এক বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে।

ঋণগ্রহীতার যাকাতের বিধান

ঋণগ্রহীতা অর্থাৎ যার নিকট মানুষের ঋণের অর্থ রয়েছে, তিনি ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থের নিসাব ও বছর পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে যাকাত প্রদান করবেন কি না, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নিম্নে তা প্রদান করা হলো—

১. ঋণ নেওয়া ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপা অথবা ব্যবসায় পণ্যের মালিক হন, তবে তিনি তার সম্পদের যাকাত দেবেন, ঋণের কারণে যাকাত মওকুফ হবে না। সেক্ষেত্রে তিনি নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ যোগ করবেন, অতঃপর পূর্ণ সম্পদের ওপর ২.৫% যাকাত প্রদান করবেন।

২. ঋণগ্রহীতা ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থের যাকাত প্রদান করবেন, যদি ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিসাব পরিমাণ হয় ও তাতে বছর পূর্ণ হয় এবং সম্পদ তার আয়ত্তে ও কর্তৃত্বে থাকে। উমর রা. যাকাত আদায়ের সময় প্রত্যক্ষ সকল সম্পদের যাকাত গ্রহণ করতেন, তা ঋণের হলেও।

৩. যদি যাকাত প্রদানের সময় ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদ চলে আসে, তবে তিনি আগে ঋণ পরিশোধ করবেন। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ যাকাতের নিসাব থেকে কমে গেলে সেই সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। অনুরূপভাবে, যার ওপর মান্নত বা কাফফারা ওয়াজিব (যেমন যিহার বা কসমের কাফফারা), তবে মান্নত বা কাফফারা আদায়ের পর তার সম্পদ নিসাব থেকে কমে গেলে তার ওপরও যাকাত আরোপিত হবে না। পুনরায় যখন নিসাব পরিমাণ হবে সঙ্গে সঙ্গে যাকাত দিতে হবে, হিজরি এক বছর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করবে না। কারণ, আগেই তাতে বছর পূর্ণ হয়েছে।

ঋণের অর্থ দিয়ে তৈরি শিল্প/কারখানা/ফ্যাক্টরির যাকাত

যে সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ নয়, সেই সম্পদ অর্জনে গৃহীত কোনো ঋণই যাকাত হিসাবের সময় বাদ দেওয়া যাবে না। যেমন : বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র,

ঘরের আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু অথবা মিল-কারখানা, ফ্যাক্টরি, মেশিনারিজ ইত্যাদি ক্রয় বা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ যাকাতের নিসাব হতে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ, এ ঋণ নিয়ে মিল-কারখানা ইত্যাদি সম্পদ অর্জিত হয়েছে; সুতরাং একদিকে ব্যক্তির ঋণ আছে, অপরদিকে ঋণের পরিবর্তে সম্পদও রয়েছে। ব্যক্তি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে উল্লিখিত সম্পদ থেকে ঋণপ্রদানকারী তার প্রাপ্য ঋণ উসুল করে নিতে পারবেন। সুতরাং এ ধরনের ঋণ যাকাতের নিসাব হতে বাদ দেওয়া যাবে না। এ ধরনের ঋণ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপা, নগদ অর্থ বা ব্যবসার মালের মালিক হলে আবশ্যকীয়ভাবেই যাকাত আদায় করবেন।

তবে উক্ত ঋণ দিয়ে ব্যবসার মালামাল ক্রয় করা হলে সেই ঋণ হতে চলতি বৎসরের পরিশোধযোগ্য কিস্তি পরিমাণ অর্থ যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে। সুতরাং প্রতি বছর যে পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে, সে পরিমাণ ঋণ বিয়োগ করে অবশিষ্ট সম্পদের ওপর চলতি বছরের যাকাত দিতে হবে।

যাকাত হিসাবে ঋণ মওকুফ করে দেওয়া

আবার যদি পাওনাদার ঋণগ্রস্ত গরিবকে এ শর্তে যাকাত দেয় যে, যাকাতের টাকা দিয়ে সে তার পাওনা পরিশোধ করবে, তাহলেও যাকাত আদায় হবে না। কারণ, সে ফেরত দেওয়ার শর্ত আরোপ করেছে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি দরিদ্র কোনো লোকের নিকট থেকে ঋণের টাকা পাওনা থাকেন, আর তিনি যাকাত বাবদ ওই টাকা মওকুফ করে দেন, তবে যাকাত আদায় হবে না।

আবার পাওনাদার যদি এ শর্তে তাকে যাকাত দেয় যে, সে ওই টাকা থেকে তার ঋণের পাওনা শোধ করবে, তাহলেও যাকাত আদায় হবে না।

তবে যাকাতদাতা যদি এ নিয়তে যাকাত দেয় যে, সে যাকাতের ওই টাকা থেকে তার পাওনা শোধ করবে, আর যাকাতগ্রহীতাও এ নিয়তে যাকাত গ্রহণ করে যে, এ টাকা নিয়ে সে তার পাওনা শোধ করবে—তাহলে এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। শর্ত হলো এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোনো চুক্তি বা শর্ত কিংবা মৌখিক আলাপ থাকবে না। এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে এবং ঋণগ্রস্তও ঋণ পরিশোধ করে ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

সপ্তম অধ্যায়
ব্যবসায়িক ও শিল্পপণ্যের যাকাত

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সব ধরনের সম্পদই ব্যবসায়িক সম্পদ হতে পারে। যেমন : জায়গাজমি, দালানকোঠা, বাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, কৃষিপণ্য, চতুষ্পদ প্রাণী, যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি। এসব সম্পদ একক বা একাধিক মালিকানাভুক্তও হতে পারে। এমনকি ব্যবসা বা পরবর্তী সময়ে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, দালান অথবা যেকোনো বস্তু বা মালামালের মূল্যের ওপরও বাজারদর হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে। অতএব, যেসব পণ্য ব্যবসার উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়, সেগুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব।

যাকাতযোগ্য বিবেচিত ব্যবসায়িক পণ্য

১. হাউজিং ব্যবসার জন্যে ক্রয়কৃত জমি, প্লট, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি ব্যবসায় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এগুলোর যাকাত প্রদান আবশ্যক।

২. বিক্রির উদ্দেশ্যে খামারে পালিত মৎস্য, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, মাছের রেনু-পোনা ইত্যাদি ব্যবসায় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়ে যাকাতযোগ্য হবে।

৩. বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ নার্সারির বীজ, গাছের চারা, কলম ইত্যাদিও ব্যবসায়ী সম্পদ হিসাবে যাকাতযোগ্য।

৪. ভাড়ায় নিয়োজিত ঘরবাড়ি, দালানকোঠা ইত্যাদির বার্ষিক ভাড়া বাবদ উপার্জিত নীট আয়ের ওপর যাকাত প্রযোজ্য।

৫. বাকি বিক্রির পাওনা, মালামাল বা কাঁচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অ্যাডভান্স, এলসি মার্জিন ও আনুষাঙ্গিক খরচ, ফেরতযোগ্য জামানত, ভাড়ার বিপরীতে প্রদত্ত ও প্রাপ্ত অ্যাডভান্স ইত্যাদিও যাকাতযোগ্য।

যাকাত অযোগ্য বিবেচিত ব্যবসায় পণ্য

১. ব্যবসার দায়-দেনা, যেমন বাকিতে ক্রয়কৃত মালামাল বা কাঁচামাল এর ক্রয়মূল্য অথবা অপরিশোধিত শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন, মজুরি, ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে উক্ত পরিমাণ অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

২. অংশীদারী ব্যবসার সামগ্রিক স্টক এবং নগদ তহবিলের ওপর যাকাত হবে না। বরং প্রত্যেক অংশীদারের অংশ এবং মুনাফার টাকার ওপর যাকাত ফরজ হবে। যদি এ অংশ এবং তার মুনাফা নিসাব পরিমাণ হয় তা হলে যাকাত ফরজ হবে; নতুবা ফরজ হবে না।

৩. কেউ যদি কোনো সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় না করে বরং তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রাখে, তা ব্যক্তিগত ব্যবহৃত সম্পদ বলে বিবেচিত হবে এবং তাতে যাকাত আরোপিত হবে না। যেমন, বসবাসের জায়গা, ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূল কাঁচামাল, দালানকোঠা, ফ্যাক্টরি ও যন্ত্রপাতি।

যেসব লেনদেন ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বিবেচিত

১. মুনাফার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়কৃত সকল পণ্য। যেমন, ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক অংশীদারী প্রকল্প, একক বা একাধিক মালিকানাধীন কোম্পানি ইত্যাদি।

২. ব্যবসায়ী দুপক্ষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিবর্গের লেনদেননির্ভর আয়-উপার্জন যাকাতযোগ্য। যেমন : ব্রোকার, মিডলম্যান, দালাল, আমদানিকারক ও বায়ার ইত্যাদি।

৩. মানি একচেঞ্জ ও এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগকারী ব্যক্তির আয়-উপার্জন যাকাতের আওতাধীন।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা দান করো উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ যা তোমরা উপার্জন করো এবং যা আমি ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি। তবে তার মধ্যকার নিকৃষ্ট বস্তু দান করার সংকল্প করো না; অথচ তোমরা তা গ্রহণকারী নও, যদি না তোমরা সেই ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে থাকো। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" সূরা বাকারা, ২ : ২৬৭

এ আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ (যা তোমরা উপার্জন করো) বাক্যাংশ দ্বারা ব্যবসায়িক সম্পদকে বোঝানো হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী র. তাঁর *সহিহ বুখারী* গ্রন্থে باب صدقة الكسب والتجارة অর্থাৎ 'উপার্জিত ও ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করেছেন। রাসূল সা. বলেছেন, "উটের ওপর যাকাত ফরজ, ছাগলের ওপর যাকাত ফরজ, গমের ওপর যাকাত ফরজ; আর ব্যবসায়িক পণ্যেও যাকাত ফরজ।"

সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেছেন, "ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুতকৃত সম্পদ থেকে নবিজি আমাদেরকে যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিতেন।"—*সুনানে আবু দাউদ*

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে তা কিছু শর্তাধীন।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি

১. ব্যক্তি ব্যবসার নিয়তে যেসব সম্পদ বা পণ্যের মালিক হয়েছেন, সেসব সম্পদ বা পণ্যের ওপরই যাকাত ধার্য হবে। কালেকশনে রাখা ও ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে গৃহীত সম্পদ ব্যবসায় পণ্য হিসেবে গণ্য হয় না বিধায় এগুলোর ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

২. কোনো পণ্যে যাকাত আরোপিত হওয়ার প্রধান শর্ত হলো ব্যক্তি ক্রয়, হেবা, মিরাস ইত্যাদি মালিকানা পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসায় পণ্যের পূর্ণ মালিক হতে হবে। ফলে কেউ ব্যবসায় পণ্যের আমানতদার, রক্ষণাবেক্ষণকারী অথবা জিম্মাদার হলে তার ওপর যাকাত ধার্য হবে না।

৩. যেসব ব্যবসায় পণ্যের মূল্য সোনা বা রুপার নিসাবের মূল্যের সমপরিমাণ হবে, সেসব পণ্যের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

৪. ব্যবসায় পণ্যের ওপর হিজরি এক বছরপূর্তি সাপেক্ষে এসব পণ্যের ওপর যাকাত ধার্য হবে।

ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যে যাকাত নির্ধারণ ও আদায়ের নীতিমালা

১. **ব্যক্তিগত পণ্য ব্যবসায়ী পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে :** কেবল ব্যবসা বা মুনাফার নিয়তে গৃহীত পণ্যের যাকাত দিতে হবে, যদিও কখনো কখনো পণ্যের মালিক মুনাফা নাও পেতে পারেন। সুতরাং কেউ বসবাসের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত বাড়ি ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি লাভে বিক্রি করলেও বাড়িটি ব্যবসায় পণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে না এবং তাতে যাকাত আরোপ হবে না। কারণ, ক্রেতা বাড়িটি ব্যবসা ও লাভের নিয়তে শুরুতে ক্রয় করেননি। একইভাবে বাজারে গাড়ির দাম বাড়ায় কেউ তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে পারেন। তবে সেটিও ব্যবসায় পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে যাকাত ধার্য হবে না।

   পক্ষান্তরে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত গাড়ির কোনো একটি গাড়ি ব্যক্তি নিজে ব্যবহার করলেও উক্ত গাড়ি তার ব্যবসায় পণ্য হিসেবে গণ্য হয়ে যাকাতের আওতায় আসবে।

২. **ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্য :** ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্যে লাভ বা লোকসান যা-ই হোক, উক্ত সম্পদ ব্যবসায় সম্পদ বলেই গণ্য হবে এবং এতে ব্যবসায় সম্পদের যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু ক্রয় করে বিক্রির পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন করে তা নিজ ব্যবহারের জন্যে নির্ধারণ করলে পরিবর্তিত নিয়তই প্রযোজ্য হবে এবং এতে যাকাত আরোপিত হবে না। কেননা, তা ব্যবসায় সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়েছে।

৩. **নিয়ত পরিবর্তন :** ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্য নিয়ত পরিবর্তন করে ব্যবসার লক্ষ্যে বিক্রয়ের নিয়ত করলে, নিয়ত অনুযায়ী তা ব্যবসায় পণ্য হিসেবে যাকাতযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যখন থেকে একজন ব্যক্তি পণ্যের বিষয়ে নিয়ত পরিবর্তন করবে তখন থেকেই তা কার্যকর হবে। অতএব, ব্যক্তিগত ব্যবহারের পণ্য মুনাফার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের দিন থেকেই তা ব্যবসায় পণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তার নিসাব পরিমাণ মূল্যের ওপর হিজরি এক বছর পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

৪. **ব্যবসায়িক সোনা-রুপার যাকাত :** সোনা ও রুপার ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক সোনা-রুপার যাকাত দেবে ব্যবসায় পণ্য হিসেবে বর্তমান বাজারমূল্য হিসেব করে শতকরা ২.৫% হারে। এক্ষেত্রে তিনি ব্যবসায়িক সোনা-রুপাকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের অলংকার হিসেবে বিবেচনা করবেন না এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের অলংকারসমূহ তার ব্যবসায়িক সোনা-রুপার সাথে যোগও করবেন না। কারণ, ব্যবসায় পণ্য আর ব্যবহারের অলংকারের যাকাতের শর্ত ও বিধান ভিন্ন।

৫. **ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত উপকরণের বিধান :** ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত আসবাবপত্রে যাকাত নেই। যেসব জিনিস ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরির মালিক তার ব্যবসার জিনিসপত্র উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের নিয়তে ক্রয় ও ব্যবহার করেন, সেগুলো মূলধন ও উৎপাদনের যন্ত্র/মেশিন হিসেবে গণ্য হবে। ব্যবসায় ও উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ, ফ্যাক্টরির ভবন, দোকানপাটের জায়গা, পরিবহন, গাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়নি—এমন জমি, ব্যবসায় ব্যবহৃত পাত্র, গুদামঘর, শো-রুমে ব্যবহৃত শেলফ, চেয়ার, টেবিল, ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক আইটেম এবং ফার্নিচার ইত্যাদি; এসব সম্পদ ব্যবসায় ব্যবহৃত ফিক্সড এসেট বা স্থির মূলসম্পদ। এগুলো যাকাতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বছর ও নিসাব পূর্তিসাপেক্ষে নির্ধারিত হারে যাকাতের আওতাধীন।

৬. **যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসার যাকাত :** যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে মোট ব্যবসার মূল্যমান যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের ওপর ব্যবসায়িক যাকাত প্রযোজ্য; এমনকি আলাদাভাবে প্রত্যেক মালিকের ব্যবসায়িক অংশ নিসাব পরিমাণ না হলেও। এটিই উত্তম পদ্ধতি।

তবে যৌথ মালিকগণের ব্যক্তিগত অংশ যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ না হলে তিনি অবধারিতভাবে যাকাত প্রদান করতেই হবে এমনটি নয়; বরং এক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা রয়েছে, যাকাত দেওয়া বা না দেওয়ার। এ জাতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত অধিকতর উত্তম ও শ্রেয়।

ব্যবসায় পণ্যে যাকাতের সময় নির্ধারণ

- ব্যবসায় পণ্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, প্রতি হিজরি বছর তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

- কেউ যদি বছরের মধ্যখানে পূর্বের ব্যবসা পরিবর্তন করে অন্য ব্যবসা শুরু করে, তবে প্রথম পণ্যের ব্যবসার তারিখ থেকেই বছর গণনা করতে হবে; কারণ, ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যই আসল, পণ্য আসল নয়।

- যদি বছরের শুরুতে কোনো ব্যক্তি যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ সম্পদের মালিক না হন, বরং বছরের মধ্যখানে অনুদান, ব্যবসায় মুনাফা বা পশুর বাচ্চা জন্ম দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু সম্পদ তার হস্তগত হয়, যা তার মোট সম্পদকে নিসাব পরিমাণ বানিয়ে দিয়েছে, তবে তার যাকাতবর্ষ শুরু হবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার দিন থেকে এবং সেদিন থেকে হিজরি বছরপূর্তিতে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে। কারণ, কোনো সম্পদের যাকাতযোগ্যতা তার নিসাব পূর্ণ হওয়ার দিন থেকেই শুরু হয়। ফলে, যেসব সম্পদ ইতিপূর্বে নিসাব পরিমাণ ছিল না, তার নিসাব পরিমাণ হওয়ার দিন থেকে হিজরি বছর গণনা শুরু হবে এবং যদি বছর শেষ হয় ও সম্পদের পরিমাণ নিসাব থেকে না কমে, তবে তার ওপর যাকাত আবশ্যক হবে।

আর যদি বছরের মধ্যবর্তী বৃদ্ধি পাওয়া সম্পদ ছাড়াই শুরু থেকে নিসাব পূর্ণ সম্পদ থাকে, অতঃপর বছরের মাঝে মুনাফা অর্জিত হয় বা পশুর বাচ্চা জন্ম দেয়, তবে এ বর্ধিত সম্পদের যাকাত নিম্নোক্ত পন্থায় প্রদান করবে—

১. যদি বর্ধিত সম্পদ মূল সম্পদ থেকে উৎপন্ন অথবা একই ক্যাটাগরিভুক্ত/নিসাবাধীন হয়, যেমন ব্যবসায়ী পণ্যের মুনাফা, বোনাসপ্রাপ্তি, শেয়ার বোনাস, ডিভিডেন্টসপ্রাপ্তি বা বছরের মাঝখানে পশুর জন্ম দেওয়া বাচ্চা ইত্যাদি, তবে তা মূল সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং বছর শেষে নির্ধারিত হারে সকল সম্পদের যাকাত দেবে। অর্থাৎ বছরের মাঝখানে অর্জিত সম্পদের আলাদা কোনো যাকাতবর্ষ গণনা হবে না। এ সম্পদের জন্যে আলাদা করে হিজরি বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়; বরং যে দিন বর্ধিত সম্পদ অর্জিত হবে, সে দিন থেকেই তা মূল সম্পদের সাথে যুক্ত হবে এবং মূল সম্পদের ওপর হিজরি এক বছর পূর্ণ হলেই মোট সম্পদের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

২. আর যদি বর্ধিত সম্পদ অন্য খাত থেকে অর্জিত হয়, যা পূর্বে যাকাত আদায়কারীর মালিকানায় ছিল না; যেমন, নিসাব পরিমাণ স্বর্ণের মালিক বছরের মধ্যখানে রুপার মালিক হয়েছেন, তবে তিনি এ জাতীয় বর্ধিত সম্পদের জন্যে আলাদা যাকাতবর্ষ নির্ধারণ করবেন এবং এ স্বতন্ত্র বছর পূর্ণ হলে এ সম্পদের আলাদা যাকাত আদায় করবেন। কারণ, এক্ষেত্রে এগুলো পৃথক দুটি সম্পদ। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সম্পদ বৈচিত্র্যময় হওয়ায় এবং নিয়মিত সম্পদ ওঠানামার মধ্যে থাকায় যাকাত ক্যালকুলেশনের জন্য একটি আধুনিক অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত।

৩. যদি কেউ কোনো সম্পদকে একই শ্রেণির অন্য সম্পদ দ্বারা বিনিময় করে (যেমন ২১ ক্যারেট স্বর্ণ ২২ ক্যারেটে, টাকাকে ডলারে, অথবা পণ্য দিয়ে সোনা কিংবা সোনা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে), তাহলে পূর্বের সম্পদের মালিকানার দিনক্ষণ ধরে যাকাতবর্ষ গণনা করা হবে, বিনিময়ের দিন থেকে নয়।

আর যদি এক শ্রেণির সম্পদ ভিন্ন শ্রেণির সম্পদ দিয়ে বিনিময় করে, তবে পূর্বের সম্পদের বছর অব্যাহত থাকবে না, নতুন সম্পদের জন্য নতুন বছর শুরু হবে। যেমন, কোনো বকরির মালিক এক জাতের বকরি দিয়ে আরেক জাতের বকরি বিনিময় করল, যার মূল্য নিসাব বরাবর বা তার চেয়ে বেশি, তাহলে পূর্বের বছর চলমান থাকবে। আর যদি বকরি দ্বারা গরু বা মহিষ বিনিময় করে, তবে পূর্বের বছর অব্যাহত থাকবে না, বরং গরু বা মহিষ থেকে নতুন বছর শুরু হবে। কারণ গরু, মহিষ আর বকরির নিসাব ও ক্যাটাগরি আলাদা।

তবে, এরূপ নিয়ম ব্যবসায় পণ্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। ব্যবসার এক পণ্য অপর পণ্য দিয়ে বিনিময় করলেও যাকাতবর্ষ অব্যাহত থাকবে। এমনকি, যদি পূর্বের পণ্যের ব্যবসা ত্যাগ করে নতুন পণ্যের ব্যবসা আরম্ভ করে, তবুও বছর অব্যাহত থাকবে। কারণ, সেটি ব্যবসার ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত একটি লেনদেন এবং ব্যবসার উদ্দেশ্য পণ্য বিনিময় করে সম্পদ বৃদ্ধি করা, এতে নির্দিষ্ট পণ্য মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। স্মর্তব্য যে, এক পণ্য দিয়ে অপর পণ্য বিনিময় করার উদ্দেশ্য যদি যাকাত থেকে অব্যাহতি ও যাকাত ফাঁকি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে ব্যক্তি চরম পাপী ও শাস্তির উপযুক্ত হবে।

যাকাতযোগ্য ব্যবসায় পণ্যের যাকাত বের করার পদ্ধতি

- হিজরি বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তি তার ব্যবসায় পণ্যসমূহ আলাদা করবে, যাকাতযোগ্য পণ্যগুলোর বর্তমান বিক্রয়দর জানবে। এক্ষেত্রে তিনি কত দামে তা ক্রয় করেছিলেন তা ধর্তব্য হবে না।

- বছরপূর্তিতে যাকাত হিসেবের সময় ব্যক্তি তার অন্যান্য সম্পদ, যেমন : নগদ-ক্যাশ, সোনা, রুপা, ব্যাংক ডিপোজিট, শেয়ার সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পাওনাদি হিসাব করে সেসব সম্পদ বা সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য ব্যবসায় পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে একসাথে সম্পূর্ণ সম্পদের যাকাত বের করবে।

- ব্যবসায় পণ্যের যাকাতের পরিমাণ হলো শতকরা ২.৫ টাকা। ব্যক্তি তার ব্যবসায় পণ্যের বর্তমান বাজারদর হিসাব করে তার সম্পূর্ণ মূল্যের শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত প্রদান করবেন।
- ব্যবসায়ী ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নিয়েছেন তা ব্যবসায় সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে যাকাতের হিসেব করবেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী চলতি বছরে যতটুকু ঋণ পরিশোধ করেছেন বা করবেন ততটুকু যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ করবেন। পরবর্তী বছরগুলোতে পরিশোধযোগ্য ঋণ বর্তমান বছরের যাকাতের হিসাবের সময় ধর্তব্য হবে না। যদি ঋণ পরিশোধ করার সময় নির্দিষ্ট না হয় অথবা পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করেন, তাহলে ঋণের অর্থ ও ঋণ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা এবং ব্যবসায় পণ্যের মূল্য একসাথে যোগ করে যাকাত দেবেন। কারণ, মালিকানাধীন সকল সম্পদের যাকাত দেওয়া তার ওপর ফরজ।

- চলতি বছরের ভ্যাট, ট্যাক্স, কাস্টমস ডিউটি, কর্মচারীদের বেতন-বোনাস, বিল্ডিং ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, অন্যান্য দাপ্তরিক ব্যয় এবং ব্যক্তিগত ও সাংসারিক খরচাদি বাবদ যা ব্যয় হবে তা যাকাত অ্যাকাউন্টিংয়ের সময় মোট সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে।

- ব্যবসায় পণ্যের যাকাত ব্যবসায় পণ্য দিয়ে দেওয়া বৈধ, অনুরূপভাবে পণ্যের বাজারমূল্য দিয়ে দেওয়াও বৈধ।

অষ্টম অধ্যায়
কোম্পানি, শেয়ার ও স্টকের যাকাত

হালাল উপায়ে অর্জিত সকল সম্পদ নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে যাকাতের অধীন। অন্যদিকে একই সম্পদের যাকাত দুবার দিতে হয় না। এ বিধানের আলোকে সকল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের যাকাত মালিকগণের পক্ষে কোম্পানি কিংবা মালিকগণ নিজেরা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা রয়েছে—

কোম্পানির যাকাতের নীতিমালা

১. কোম্পানির যাকাত নিম্নোক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে দিতে পারেন :

- কোম্পানির মোট অর্থের যাকাত কোম্পানির পক্ষ থেকে দিতে হবে। এতে সকল বিনিয়োগকারীর অর্থের যাকাত দেওয়া হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত যাকাত হিসাব করার সময় এ অংশ বাদ দিতে হবে।

- অথবা প্রত্যেকে যাকাত দেওয়ার সময় কোম্পানি থেকে নিজের অংশের স্থিতি (balance) জেনে নেবেন এবং নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে যাকাত প্রদান করবেন।

- কোম্পানির যাকাত হিসাবের সময় স্থায়ী সম্পদ (fixed assets) ছাড়া অন্য সব ধরনের সম্পদ যাকাত হিসেবের আওতায় আসবে।

- ব্যবসা-বিনিয়োগের ঋণের ক্ষেত্রে ততটুকু দায় (liability) হিসেবে পরিগণিত হবে, যতটুকু একান্তই ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়েছে। কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ (fixed assets) বাড়াতে নেওয়া ঋণ দায় হিসেবে দেখানো যাবে না। কারণ, যে সম্পদের যাকাত নেই, সে সম্পদ অর্জনে গৃহীত ঋণও যাকাত ক্যালকুলেশনের দায় হিসেবে পরিগণিত নয়।

- প্রক্রিয়াধীন ব্যবসায় পণ্য এবং পণ্য নির্মাণে ব্যবহৃত সকল কাঁচামালের ওপর যাকাত প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে নির্মাণ শিল্প, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প ইত্যাদির সকল কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াধীন সকল পণ্য যাকাতের ক্যালকুলেশনের সময় সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।

- যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-এর সময় এরূপ রেজ্যুলেশন গ্রহণ করতে হবে যে, এ কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী সকলের যাকাত কোম্পানি প্রদান করবে অথবা সকল মালিক তাদের অংশের যাকাত আলাদাভাবে প্রদান করবেন।

- কোম্পানি যাকাতের রেট হলো পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ = নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ/আয় থেকে ২.৫%। আর ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হিসাব করলে ২.৫৮%।

যৌথ মূলধনী কোম্পানির যাকাত

যৌথ মূলধনী (Joint capital) কোম্পানির মোট মূলধনকে সমান মূল্যবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করা হয়। এরূপ ক্ষুদ্রাংশগুলোকে শেয়ার (Share) বলে। এরূপ শেয়ারের মালিককে কোম্পানির নিট সম্পত্তির একজন অংশীদার (শেয়ারহোল্ডার/ Share Holder) গণ্য করা হয়।

কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো—বৃহৎ কোম্পানির ব্যবসায় বিনিয়োগ, কোম্পানির আংশিক মালিকানা অর্জন এবং লভ্যাংশ বা মুনাফা অর্জন করা। তবে যেসব কোম্পানি ইসলামে নিষিদ্ধ অসামাজিক বা অনৈতিক ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বা সুদী কারবার ও দৈবনির্ভর লেনদেনে নিয়োজিত সেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা বৈধ নয়।

যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিজেই শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে অথবা শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেরাই নিজেদের যাকাত প্রদান করতে পারেন। কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে শেয়ারের ওপর নির্ধারিত যাকাত প্রদান করে থাকলে শেয়ার মালিকদের নিজস্ব মালিকানাধীন শেয়ারের ওপর যাকাত দিতে হবে না। অন্যথায়, শেয়ার মালিকদের যথাযথ হিসাব-নিকাশ করে যাকাত পরিশোধ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যাকাতযোগ্য কোনো সম্পদই যাকাতের বাইরে থাকবে না। আবার কোনো সম্পদের যাকাত দুবার দেওয়া হবে না।

শেয়ার মালিকদের পক্ষ থেকে কোম্পানি যাকাত প্রদান করতে হলে কোম্পানির উপবিধিতে (By Laws) উল্লেখ থাকতে হবে অথবা কোম্পানির সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে, যেখানে শেয়ার মালিকরা কোম্পানিকে যাকাত প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

শেয়ার ব্যবসা : ইসলামি দৃষ্টিকোণ

শেয়ার ব্যবসা কী?

সাধারণত কয়েকজন মিলে কোনো ব্যবসা করাই শেয়ার ব্যবসা। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অংশীদারিত্বে যে ব্যবসা পরিচালিত হয়, প্রকৃত অর্থে তা-ই শেয়ার ব্যবসা। তবে আধুনিক কালে প্রচলিত স্টক একচেঞ্জের শেয়ার ব্যবসার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন। প্রচলিত স্টক একচেঞ্জের শেয়ার ব্যবসা বলতে মূলত সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ারের মালিকানার ক্রয়-বিক্রয়কে বোঝায়। কোম্পানি থেকে ক্রয়কৃত শেয়ার পরবর্তী সময়ে সেকেন্ডারি মার্কেটে সরাসরি ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে হাতের পর হাত বদল হতে থাকে। এর সাথে কোম্পানির মূলধন, অ্যাসেট ইত্যাদির প্রায় কোনো সম্পর্কই থাকে না। বরং নিজস্ব গতিতে সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ারের দাম ওঠানামা করে।

ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিতে আধুনিক শেয়ারবাজার

ব্যবসা সম্পর্কে ইসলামি শরিয়ার দুটি মূলনীতি রয়েছে। কুরআনে এসেছে, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫

সুতরাং ব্যবসার ক্ষেত্রে যেকোনো ক্রয়-বিক্রয় মৌলিকভাবে হালাল হতে হবে এবং এর সাথে সুদের কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না। কোনো ব্যবসা সুদভিত্তিক হলে তা প্রথমেই হারাম। আর সুদের অনুপস্থিতিতে হারামের অন্যান্য উপাদান, যেমন : ধোঁকা, জুয়া ইত্যাদি থাকলেও তা হারাম। শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো মনে রাখা দরকার—

১. যেসব কোম্পানির মূল ব্যবসা ও লেনদেন শরিয়াহসম্মত এবং সুদমুক্ত সেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। তবে হালাল ব্যবসাকারী কোম্পানিসমূহের শেয়ার ব্যবসার সাথে জুয়ার (Gambling) কোনো আশঙ্কা থাকলে সেসব কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করা যাবে না।

২. যেসব কোম্পানির মূল ব্যবসা হারাম, সেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। যেমন : মদ বা মাদকদ্রব্য উৎপাদন বা ব্যবসা, সুদী ব্যাংক-বীমা-লিজিং এবং যে ব্যবসায় সুদের অর্থ লগ্নি করা হয়েছে।

৩. যেসব কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল; কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তা শরিয়াহবিরোধী কাজ বা সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত। সেক্ষেত্রে শরিয়ার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে :

প্রথমত, এসব কোম্পানির প্রাইমারি শেয়ার যদি এ উদ্দেশ্যে কেনা হয় যে, মূল কোম্পানিতে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বছর শেষে মুনাফা (Dividend) পাওয়া যাবে, তাহলে ৪টি শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ হবে :

ক) কোম্পানির মূল কারবার হালাল হতে হবে;

খ) শেয়ারের ফেস ভ্যালুর (Face Value) চেয়ে কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির নগদ অর্থ (Liquid Asset) ইত্যাদির সাথে সাথে স্থির সম্পদ (Fixed Asset), যেমন : পণ্য, বিল্ডিং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ থাকা;

গ) কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) সুদী লেনদেন ও শরিয়াহবিরোধী অন্যান্য কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করা;

ঘ) যদি কোম্পানি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ তার শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বণ্টিত লভ্যাংশের মধ্যে শামিল করা হয়, তাহলে কোম্পানির 'ব্যালেন্সশিট' তথা আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখে সুদের আনুপাতিক অংশটুকু সাওয়াবের নিয়ত না করে সাদাকা করে দেবে।

দ্বিতীয়ত, আর যদি ক্যাপিটাল গেইন (Capital Gain)-এর জন্য শেয়ার ক্রয় করা হয়, যাতে কোম্পানির লভ্যাংশ নয়; বরং শেয়ারকে স্বতন্ত্র পণ্য হিসেবে কেনাবেচা করাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও শেষোক্ত দুটি শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ হবে।

৪) শেয়ার ব্যবসায় সকল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি, ফটকাবাজি, প্রতারণা ও জুয়ামুক্ত হতে হবে। অন্যথায় এর দ্বারা যে আয় হবে তা হালাল হবে না।

৫) একজন শেয়ার মালিক ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় শেয়ার বিক্রি করে দিতে পারেন। কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের এ স্বাধীনতা শেয়ার বাজারকে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যে, কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে বা কমিয়ে একটি সাধারণ ব্যবসা কার্যক্রমকে প্রায় জুয়াখেলায় পরিণত করে। এমন হলে তা ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ বিবেচিত হবে।

ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিতে শেয়ারের বিশ্লেষণ

আধুনিক কালে শেয়ারের দ্বিমুখী সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায় : কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্টতা ও শেয়ারবাজার বা পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা।

১) কোম্পানি ঘোষিত বার্ষিক লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারের অ্যাকাউন্টে জমা হয় অথবা লভ্যাংশের পরিবর্তে প্রদত্ত বোনাস শেয়ার শেয়ারমালিকের বি.ও. অ্যাকাউন্টে জমা হয়, কিংবা রাইট শেয়ার নিতে চাইলে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেলে শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ব্যক্তিগত শেয়ারসমূহের আনুপাতিক হারে কোম্পানির সকল সম্পদে অংশীদার হয়ে থাকেন। অতএব, এক্ষেত্রে শেয়ারের অর্থ দাঁড়ায় কোম্পানির সকল সম্পদে আনুপাতিক অংশীদারিত্ব।

২) অন্যদিকে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো থাকে প্রায় স্বতন্ত্র। এখানে শেয়ারের মূল্যমান ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়। দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গ্রাহকদের চাহিদা বা অনীহা ইত্যাদি বিষয়াদি শেয়ারের মূল্যমান নির্ধারণে বিরাট ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির লাভ-লোকসানের সাথে শেয়ারবাজারে শেয়ারমূল্যের উত্থান বা পতনের খুব বেশি সামঞ্জস্য থাকে না। তা ছাড়া শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িতদের অধিকাংশের ধারণাই নেই যে, তিনি কোম্পানির আনুপাতিক অংশের ক্রয়-বিক্রয় করছেন। ফলে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারের কেনাবেচা শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ারসংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

শেয়ার ব্যবসার প্রকারভেদ :

শেয়ারের যাকাতযোগ্যতা বিচার করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির বিবেচনায় শেয়ারের প্রকারভেদ নির্ণয় করা জরুরি।

(১) শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মূলধনের অংশীদার হয়ে মুনাফা অর্জন করা :

শেয়ারের মালিক কোম্পানির মূলধনে বিনিয়োগ করে বার্ষিক ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শেয়ার ক্রয় করেন। কোম্পানির AGM থেকে যে লভ্যাংশ ঘোষণা হবে তা-ই তার উদ্দেশ্য। এ প্রকার শেয়ার আবার দুই ভাগে বিভক্ত—

প্রথমত : কোম্পানি ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। যেমন, কোম্পানি কলকারখানা স্থাপন করে লোহা, সিমেন্ট বা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে বাজারজাতের মাধ্যমে ব্যবসা ও মুনাফা অর্জন করে। এক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার মালিকগণকে যে পরিমাণ অর্থ কলকারখানা ও মেশিনারিজ ইত্যাদি স্থাপনে ব্যবহৃত হয়েছে, তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূলধন, উৎপাদিত দ্রব্য ও অর্জিত মুনাফার যাকাত দিতে হবে। এজন্য শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির ব্যালেন্সশিট দেখে এর স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets) ও যাকাতযোগ্য সম্পদের অনুপাত বের করবেন। কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ বলতে বিল্ডিং, মেশিন, জমি, গাড়ি ইত্যাদি (অর্থাৎ যেগুলো বিক্রি করা হয় না); আর যাকাতযোগ্য সম্পদ বলতে নগদ টাকা, ব্যবসায়িক সামগ্রী ও বিভিন্ন পর্যায়ের কাঁচামাল ইত্যাদি বোঝায়। অতঃপর কোম্পানির মোট সম্পদের (Assets) যত পার্সেন্ট যাকাতযোগ্য হয়, শেয়ার মালিক তার শেয়ারের বাজারদরের তত পার্সেন্ট এর যাকাত আদায় করবেন।

সুতরাং কেউ এমন শেয়ার কিনলেন, যার ফেস ভ্যালু ১০০ টাকা। আজ তার বাজারদর ২০০ টাকা। এদিকে কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ মোট সম্পদের ২০ পার্সেন্ট। আর নগদ টাকা, ব্যবসায়িক পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি ৮০ পার্সেন্ট। সুতরাং কোম্পানির যাকাতযোগ্য সম্পদ হলো ৮০ পার্সেন্ট, আর ২০ পার্সেন্ট যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়। অতএব, শেয়ার মালিক—যিনি লভ্যাংশের উদ্দেশে শেয়ার ক্রয় করেছেন—তিনি আজ যাকাত দেবেন [২০০-(২০*২)] = ১৬০ টাকার। তিনি শেয়ারের বছরপূর্তি ও নিসাব পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে, আলাদাভাবে বা তার মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাতযোগ্য সমস্ত সম্পত্তির ওপর শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত দেবেন।

কিন্তু যদি কোম্পানির ব্যালেন্সশিট বা হিসাবপত্র সম্পর্কে শেয়ারের মালিকের কোনো ধারণা না থাকে, অথবা কোম্পানির ব্যালেন্সশিট পাওয়া না যায় বা কোম্পানির আর্থিক অবস্থা জানা না যায়, তবে সতকর্তামূলক পূর্ণ বাজারদরের যাকাত দিয়ে দেবেন। অথবা তিনি তার মালিকানাধীন শেয়ারের বার্ষিক মুনাফা যাকাতযোগ্য অন্য সম্পত্তির মূল্যের সঙ্গে যোগ করে মোট মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে ২.৫% যাকাত প্রদান করবেন।

দ্বিতীয়ত : কোম্পানি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে না, বরং ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য ভাড়া দিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। যেমন : কোম্পানি দোকান, ভবন, বাস-ট্রাক, সিএনজি ট্যাক্সি ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এমন কোম্পানির শেয়ার মালিকগণ তাদের শেয়ারের মূলধনের ওপরে যাকাত দেবেন না, বরং তা থেকে অর্জিত মুনাফার ওপরে যাকাত দেবেন। এসব দ্রব্যাদি ব্যবসায়িক উপার্জনের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফাই শুধু যাকাতযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং কেউ যদি এমন কোম্পানির কিছু শেয়ার কেনে, যে কোম্পানি পরিবহনের ব্যবসা করে। তার ক্রয়কৃত প্রত্যেকটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০০ টাকা। বর্তমানে তার বাজারদর ১৫০ টাকা। এদিকে কোম্পানি স্বীয় অর্থ ও শেয়ারহোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পরিবহন ক্রয়, অফিস স্থাপনা তৈরি এবং অন্যান্য পেপারস-ডকুমেন্টস প্রস্তুতে খরচ করেছে। বছরশেষে এজিএম-এর মাধ্যমে লভ্যাংশ ঘোষণা করে শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিধিমতো বণ্টন করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শেয়ার মালিক তার মূলধনের জন্যে কোনো যাকাত প্রদান করবেন না, বরং শেয়ারের বছরপূর্তি হলে প্রাপ্ত লভ্যাংশ মালিকানা অর্জন ও নিসাব পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে আলাদাভাবে বা তার মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাতযোগ্য সমস্ত সম্পত্তির ওপর শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত দেবেন।

যদি কোম্পানি তার প্রসপেক্টাস বা বাৎসরিক সভায় এ কথা উল্লেখ করে যে, প্রতি বছর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক শেয়ারহোল্ডারের যাকাত কোম্পানি নিজ উদ্যোগে আদায় করে দেবে, তবে কোম্পানি এ দায়িত্ব পালন করবে। অন্যথায় শেয়ারহোল্ডারগণ প্রত্যেকেই নিজ অংশের শেয়ারের যাকাত আদায় করে দেবেন। শেয়ারের মুনাফা বছরের যেকোনো সময় হস্তগত হোক না কেন, যাকাত আদায়ের সময় নিজের

অন্যান্য মালের সাথে প্রাপ্ত মুনাফা অথবা প্রাপ্ত মুনাফার অবশিষ্টাংশ মিলিয়ে সম্মিলিত যোগফলের যাকাত আদায় করবেন। শর্ত হলো, শেয়ার থেকে প্রাপ্ত মুনাফা অথবা অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে সমন্বিত সম্পদ অথবা শুধু শেয়ার ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে স্বীয় মালিকানাধীন এ জাতীয় সকল শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাতের নিসাব পরিমাণ হতে হবে এবং বছরপূর্তি হতে হবে।

২) শেয়ার-ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করা : কিছু লোক শেয়ারের দরপতন ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করেন।

ক্যাপিটাল গেইন তথা শেয়ারকে অন্যান্য পণ্যের মতো বেচাকেনা করে মুনাফা অর্জন করেন। এক্ষেত্রে শেয়ারের মালিক কোম্পানির মূলধনে বিনিয়োগ করেন না, বরং শেয়ার মালিক ব্যবসা (মূলধনীয় মুনাফা) করার জন্য শেয়ারগুলো ব্যবহার করেন। অতএব, শেয়ারহোল্ডার যেদিন স্বীয় শেয়ারের যাকাত প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন, শেয়ারের সেদিনের বাজার মূল্য (Market Value) ধরে তার মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে নিসাব ও বছরপূর্তি সাপেক্ষে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন; ফেস ভ্যালুর (Face Value) ওপর নয়।

শেয়ারের যাকাতযোগ্যতার নীতিমালা

শেয়ারের যাকাত অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শেখ সালিহ আল-উসাইমিন বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে এ অর্থে যে, সে আজ শেয়ার ক্রয় করে আগামীকাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, তবে এ জাতীয় শেয়ারের মূল্যের এবং তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফার যাকাত প্রতি বছর প্রদান করবেন। কিন্তু যদি শেয়ার কেনার মূল উদ্দেশ্য হয় বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব এবং ব্যক্তি তা বিক্রি করে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে না, তবে এ থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ, স্বর্ণ, রুপা ইত্যাদির যাকাত প্রতি বছরান্তে প্রদান করবেন। আর যদি ব্যক্তি শেয়ারের বিপরীতে বছরান্তে কোনো পণ্য বা সুবিধা পায় যা অর্থকড়ি বা স্বর্ণ-রুপা নয়, তবে তাতে যাকাত নেই; বরং বছরান্তে এর কারণে যেসব সুবিধা পাবেন তার ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।"

বিভিন্ন প্রকার বন্ডের যাকাত

বন্ড হলো এমন একটি প্রত্যয়নপত্র, যা ইস্যুকারী এর বাহককে গায়ে লেখা মূল্য (ফেস ভ্যালু) প্রদান করতে বাধ্য থাকে, যখন সে তার হকদার হয়। সাথে সাথে বন্ডের মূল্যের সাথে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত লাভও প্রদান করা হয়। এটি পরিষ্কার সুদ ও হারাম। সে হিসেবে সাধারণভাবে লেনদেনকৃত বন্ড অবৈধ; কেননা তা এমন একটি ধার, যার সাথে সরাসরি লাভযুক্ত রয়েছে। যারা এ ধরনের লেনদেনের সাথে যুক্ত রয়েছে তাদের উচিত আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

বন্ডের যাকাতের হুকুম ঋণের যাকাতের মতোই। নিসাব পরিমাণ হলে এতে যাকাত ফরজ হবে। অথবা বন্ডধারী ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদ, যেমন : টাকাপয়সা, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদি একসাথে মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরজ হবে এবং ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি বন্ড এমন হয় যা সুনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ভাঙানো যাবে না, এমতাবস্থায়ও যাকাত রহিত হবে না, বরং যখন ভাঙানো যাবে, তখন বিগত সব বছরের যাকাত প্রদান আবশ্যক হবে।

গায়ে লেখা মূল্য (ফেস ভ্যালু) প্রদান করে কেউ প্রাইজবন্ড ক্রয় করে থাকলে এবং তা তার কাছে এক বছর জমা থাকলে তার ওপর তাকে যাকাত দিতে হবে। কারণ, প্রাইজবন্ড নগদ টাকার মতোই, যা যেকোনো সময় ভাঙানো যায়।

নবম অধ্যায়
জমিজমা ও ইজারা সম্পত্তির যাকাত

জমিজমার যাকাত

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ভূমির উপযোগ বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেড়েছে এর বহুবিদ ও বিভিন্নমুখী ব্যবহার। ফলে ভূমির বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর যাকাতের বিধানের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে ভূমির ব্যবহার এতটা বিবিধ ও ব্যাপক না থাকায় ভূমির যাকাতের বিধানও ছিল কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এখানে ভূমি বলতে আমরা শুধু জমিকেই বোঝাচ্ছি না; বরং ভূমি বলতে বোঝাচ্ছি ভূমি এবং ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থাপনা। তা ছাড়া রিয়েল এস্টেট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, বাসা-বাড়ি, ফ্ল্যাট, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-শপিং মল, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, গুদাম ইত্যাদি ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভূমিসমূহ। আর এরূপ ভূমির মালিকানা যেকোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, যেমন : ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার ইত্যাদি, তাতে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে যাকাত প্রযোজ্য হবে।

জমির যাকাতযোগ্যতা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্র

১. ভূমির যাকাতযোগ্যতার বিষয়টি ভূমির ব্যবহার (যেমন : বিক্রয়, ভাড়া, নিজ বসবাসের বাসাবাড়ি নির্মাণ বা ফসল উৎপাদন ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবহার) ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

২. ভূমির যাকাত বালেগ, নাবালেগ, বুদ্ধিমান, নির্বুদ্ধি, এতিম, এতিম নয় এমন সকলের ওপরই সমানভাবে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য।

৩. ভূমির যাকাতযোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা অর্ধেক বা কিয়দাংশ ভূমির মালিক হলেও তার মূল্যমান নিসাব পরিমাণ পৌঁছলেই তাতে যাকাত আরোপিত হবে।

৪. ভূমির যাকাত কখনো আরোপিত হয় মূল ভূমির মূল্যমানের ওপর, আবার কখনো ভূমির উপার্জন, উৎপাদন ও ফসল ইত্যাদির ওপর প্রযোজ্য।

৫. ভূমির যাকাত হিসাব করা হবে প্রতি চন্দ্রবছর শেষে একটি নির্ধারিত দিন তারিখে, তৎকালীন বাজারমূল্য অনুসারে, চাই বাজারমূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি বা কম হোক। আর বছরপূর্তি হিসেব করা হবে ব্যক্তি যে অর্থ দিয়ে এ ভূমি ক্রয় করেছে তার মালিকানার দিন থেকে, ভূমি ক্রয়ের দিন থেকে নয়।

৬. জমিজমার যাকাতের ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য হলো, যেসব ভূমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে তা যাকাতযোগ্য। যেসব ভূমিতে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন, অথবা আপন বসবাসের বাড়িঘর নির্মাণের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেগুলোর ওপর যাকাত প্রযোজ্য নয়।

৭. ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণের সময়ই কেউ ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়তে করুক বা পরবর্তীতে সেই নিয়ত করুক, তাতে বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না। অতএব, ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়তে থাকলেই যেকোনো ভূমি যাকাতবহির্ভূত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে, যদিও তা কারো কাছে যুগযুগ ধরে থেকে যায়।

ভূমি যাকাতযোগ্য হবার দলিল

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

"তাদের ধনসম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করতে ও তাদের পরিশোধিত করতে পারবেন, আর আপনি প্রার্থনা করুন তাদের জন্যে; নিঃসন্দেহ আপনার প্রার্থনা তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।" সূরা তাওবা, ৯ : ১০৩

সামুরাহ বিন জুনদুব রা. বলেন, "রাসূল সা. আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যা কিছুই ব্যবসার জন্যে প্রস্তুত করি, তা থেকে যেন যাকাত দিই।"—*সুনানে আবু দাউদ*

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভূমির যাকাতের নিসাব পরিমাণ

অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভূমির নিসাব হলো ৮৫ গ্রাম সোনা অথবা ৫৯৫ গ্রাম রুপার বর্তমান বাজারমূল্য। পরিমাণ হলো, বছরান্তে ভূমির বাজারমূল্য হিসেব করে তার ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। ব্যক্তি ভূমির মালিক হওয়া অথবা ভূমি ক্রয়ের দিন থেকে যাকাতবর্ষ গণনা করবেন এবং বছরান্তে নিসাবপূর্তি সাপেক্ষে বর্তমান বাজারদর হিসেবে আলাদা বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে ২.৫% হারে মুদ্রায় যাকাত প্রদান করবেন।

ব্যবসায়িক ভূমির যাকাতের নীতিমালা

ব্যবসার জন্য রক্ষিত ভূমির যাকাতযোগ্যতার বিষয়ে নিম্নোক্ত বিধান প্রযোজ্য। যাচাই করলে দেখা যায় যে, মুসলিমদের মালিকানাধীন ভূমি পাঁচ ধরনের—

১. ভবিষ্যতে নিজের আবাসন নির্মাণ অথবা সন্তানদের জন্য সম্পদ হিসাবে ক্রয়কৃত ভূমি। এ ধরনের জমির কোনো যাকাত আসবে না।

২. ভবিষ্যতে ঘর বা মার্কেট দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি। এ প্রকার ভূমি ওপরও যাকাত আসবে না। তবে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর নিসাব পূর্ণ হয়ে এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আসবে।

৩. ফসল উৎপাদনের জমির ওপরও যাকাত হবে না। তবে উৎপাদিত ফসলের ওপর শরিয়াহ মোতাবেক উশর দিতে হবে।

৪. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি অর্থাৎ দাম বাড়ার পর বিক্রি করে দেওয়ার নিয়তে ক্রয়কৃত ভূমির যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। যদি সে ভূমির মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়; কেননা এ ধরনের ভূমি ব্যবসায় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

৫. ক্রয়কৃত ভূমির ওপর বিল্ডিং নির্মাণ করে নির্মাণাবস্থায় বা নির্মাণ পূর্ণ হওয়ার পর ফ্ল্যাট হিসাবে বিক্রি করা হবে—এ ধরনের ভূমি ও বিল্ডিংয়ের দামের ওপর প্রতি বছর যাকাত দিতে হবে। এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকিহগণের মত রয়েছে। তাদের মতে, ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যা যা শর্ত রয়েছে, সবগুলো এখানে পাওয়া যায়।

ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত ভূমির যাকাতের মাসায়েল

১. যদি কেউ কিস্তিতেও কোনো ভূমি ক্রয় করে, তবে তিনি কিস্তিতে যতটুকু অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, ততটুকু অর্থের ওপর যাকাত পরিশোধ করবেন। ভূমি ক্রয়কারী ব্যক্তি অন্য কোনো ঋণে আবদ্ধ থাকলেই তার ভূমির যাকাত রহিত হয়ে যাবে না। ব্যক্তি অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে ঋণ শর্তসাপেক্ষে সমন্বয় করে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।

২. ভূমির মূল্যমান নির্ধারণ হবে ভূমিসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পরই। ব্যবসার নিয়তে ক্রয়কৃত ভূমিমাত্রই যাকাতযোগ্য, চাই তা রেজিস্ট্রি করা হোক বা না হোক। কারণ, ব্যক্তির ভূমি ক্রয় ও ক্রয়মূল্য প্রদানের সময় করা ব্যবসার নিয়ত এটিকে যাকাতযোগ্য বানিয়েছে।

৩. কৃষিভূমিকে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাকাতযোগ্য অন্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে বছরান্তে যাকাতের হিসাব করতে হবে। কৃষিভূমিকে অর্থকড়ির বিনিময়ে ভাড়া দিলে এ অর্থ যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে বছরান্তে যাকাতের হিসাব করতে হবে।

৪. শিল্প, কল-কারখানা ও বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত সেবাপ্রতিষ্ঠান (যেমন : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি) নির্মাণের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমির ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

৫. যদি ব্যক্তি তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মালিকানাধীন ভূমি বছরপূর্তিতে বিক্রি না করেন, অথবা বিক্রি করতে পারছেন না, অথবা ভূমির যাকাত প্রদানের মতো অর্থ তার নিকট নেই, তাহলে তিনি যখন উক্ত জমি যখন বিক্রি করবেন, তখন পূর্বের বছরসমূহের যাকাত আদায় করবেন।

৬. ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেনা ভূমি বছরপূর্তির পূর্বেই ব্যক্তিগত ব্যবহার, বসবাসের বাসাবাড়ি অথবা ইজারা প্রদানের নিমিত্তে ইমারাত নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন, তবে এরূপ ভূমি যাকাতযোগ্য হবে না। কিন্তু বছরপূর্তির পর নিয়ত পরিবর্তন করলে এক বছরের যাকাত পরিশোধ করবেন।

তবে জমির যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ ঠিক বছরপূর্তির পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন করলে বলপূর্বক যাকাত আদায় করা যেতে পারে।

৭. ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিনে যদি এমন নিয়ত করে থাকে যে, ভূমিটি পরিপূর্ণ বিক্রি হওয়া পর্যন্ত বা বিক্রি করার পূর্বে নির্ধারিত সময় তিনি এটিকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করবেন, তবে তাকে প্রতি বছর নিসাব পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে ভূমির বিক্রয়যোগ্য মূল্যের ওপর নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে মালিকানার মূল উদ্দেশ্য ধর্তব্য হবে।

৮. কেউ যদি কোনো নিজস্ব ব্যবহার অথবা ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে এবং পাশাপাশি এই নিয়ত করে যে, তিনি তা বিক্রি করে দেবেন নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর, অথবা তার পরিবর্তে আরেকটি উত্তম ভূমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য কোনো কারণে; এই ভূমির ওপর যাকাত আরোপিত হবে না, কারণ এখানে ব্যবসা অথবা লাভ করার কোনো উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন, কোনো ব্যক্তি ভাড়ায় চালানোর উদ্দেশ্যে একটি ট্যাক্সি কিনে দুই/তিন বছর চালানোর পর তা বিক্রি করে দিয়ে আরেকটি ট্যাক্সি ক্রয় করল, অথবা একটি বসবাসের জন্যে একটি ফ্ল্যাট কিনে কয়েক বছর পর সেটি বিক্রি করে দিয়ে আরেকটি ফ্ল্যাট কিনল, এ ব্যক্তির ট্যাক্সি বা ফ্ল্যাটের বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনো যাকাত ধার্য হবে না।

৯. ভূমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ অন্য ভূমি ক্রয় বা অন্য কাজে নিয়োজিত করার পূর্বে ব্যক্তির যাকাত বর্ষপূর্তি পর্যন্ত থেকে গেলে সেই অর্থ যাকাতের অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত প্রদান করবেন।

১০. যদি কেউ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্থাপনা তৈরি করে বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো ভূমি ক্রয় করে, তবে সেই ভূমি এবং তার ওপর নির্মিতব্য স্থাপনার ওপর যাকাত ধার্য হবে, চাই তার নির্মাণ অথবা বিক্রি সম্পূর্ণ হোক বা অসম্পূর্ণ হোক। আর এ যাকাত নির্ধারিত হবে ভূমি ও স্থাপনার সমন্বিত বর্তমান মূল্যের ওপর।

১১. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি যদি বন্ধক রাখা হয়, তবে বছরপূর্তিতে সেই ভূমির যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

- যদি কেউ এ শর্তে ভূমি ওয়াকফ করে যে, তার মৃত্যুর পর এ ওয়াকফ কার্যকর হবে, তবে এটি জনকল্যাণে করা ওয়াকফ হলে ওয়াকফকারী ব্যক্তির মৃত্যুর দিন থেকে এ ভূমির যাকাত রহিত হবে। আর যদি এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পারিবারিক ওয়াকফ হয়, তবে এ ভূমির যাকাত রহিত হবে না।

- ব্যবসায় ভূমির মূল্য কমে গেলেও তাতে যাকাত প্রযোজ্য হবে, যদি কমে যাওয়ার পরও ভূমির মূল্য যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয়।

- যে ভূমির মালিকানা গ্রহণে ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত (জমির বৈধতাসংক্রান্ত বিরোধ, অন্যের মালিকানা দাবি, মালিকানা নিয়ে শরিকগণ, নগর প্রশাসন বা রাষ্ট্রের সাথে আইনি দ্বন্দ্ব, কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষ মালিকানা স্থগিত করেছে, অথবা জনকল্যাণমূলক কাজে অধিগ্রহণকৃত) অথবা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির টালমাটাল অবস্থার কারণে ভূমির মালিকানা হস্তান্তরে অনিশ্চয়তা রয়েছে অথবা স্থানীয়-অস্থানীয় সন্ত্রাসীদের ভয়ে ব্যক্তি তার ভূমির মালিকানা ও ভোগদখল নিশ্চিত করতে পারছেন না, এমন ভূমির ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে ব্যক্তির সন্দেহাতীত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তিনি তাতে স্বাধীন হস্তক্ষেপ করতে পারছেন না।

- সরকারিভাবে অথবা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-আদালত ইত্যাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিকল্পনার কারণে অধিগ্রহণকৃত ব্যবসায়িক ভূমির ওপর যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু এরূপ ভূমি কখনো অধিগ্রহণমুক্ত হলে অধিগ্রহণমুক্তির দিন থেকে বছরপূর্তি যাকাত ধার্য হবে।

- তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি বছরান্তে যাকাত প্রদানের পর কোনো কারণে যদি তার মালিকানা রহিত বা বাতিল করা হয়, তবে প্রদত্ত যাকাতের অর্থ ফেরত নেওয়া অথবা ভবিষ্যতে প্রদানযোগ্য অন্যান্য যাকাতের সাথে তা সমন্বয় করা বৈধ হবে না।

- বিক্রয়ের জন্যে গৃহীত ভূমি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হলে এবং এ ভূমির বিগত বছর বা বছরগুলোর যাকাত অপরিশোধিত থাকলে উত্তরাধিকারীগণ যথাসম্ভব তা পরিশোধ করে দেবেন, অথবা

উত্তরাধিকার নিশ্চিত হওয়ার পর যদি তারা তা বিক্রির নিয়ত রাখেন, তবে বিক্রির নিয়তের দিন থেকে শুরু করে বছরপূর্তির পর নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করবেন।

ইজারাকৃত ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির যাকাত

যেসব ভূমি অথবা ভূমির ওপর নির্মিত স্থাপনাসমূহ ইজারা দেওয়া হয়েছে, সেসব সম্পদকে ইসলামি যাকাত অর্থনীতির পরিভাষায় 'উপার্জনের জন্যে ব্যবহৃত সম্পদ' বা (ইংরেজিতে Exploited Assets) বলা হয়। এগুলো এমন সম্পদ বা ভূমি, যার মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্য বিক্রি করা নয়, বরং ভূমিটি বা ভূমির ওপর নির্মিত স্থাপনা ইজারা দিয়ে অথবা তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে তার থেকে আয়-উপকার অর্জনই মূল লক্ষ্য।

ব্যবসায়িক ভূমি ও ইজারা বা উপার্জনের জন্যে ব্যবহৃত ভূমির মধ্যে পার্থক্য হলো, ব্যবসায়ের ভূমির মূল মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে এর থেকে আয় অর্জন করা হয়, আর ইজারা ও উপার্জনযোগ্য ভূমি হলো, যে ভূমির মূল মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না, তবে তা থেকে ব্যক্তি নতুন নতুন আয় করে থাকেন। ফলে এটি একদিকে ব্যবসায়িক পণ্য নয়, অন্যদিকে এটি ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণেও ব্যবহৃত নয়।

ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনার ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান

- ভাড়ায় প্রদত্ত ভূমি বা ভূমির ওপর নির্মিতব্য, নির্মিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনাদি এবং অ্যাপার্টমেন্টের ওপর স্বয়ং যাকাত নেই, বরং এসব ভূমি বা স্থাপনা থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর শর্তসাপেক্ষে যাকাত প্রযোজ্য।

- ফসলের ভূমির মালিক ভূমি নগদ অর্থের বিনিময়ে ইজারা দিলে ইজারালব্ধ অর্থের ওপর বছরপূর্তি ও নিসাব পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে যাকাত প্রযোজ্য হবে এবং ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করবেন।

- ইজারাপ্রদত্ত সম্পত্তি কোথাও বন্ধক রাখা থাকলে অথবা সম্পত্তির ক্রয়মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না করায় ক্রেতার নামে রেজিস্ট্রি না করা হলে অথবা ব্যক্তি অন্য কোনো ঋণে আবদ্ধ থাকলেও ইজারার সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে।

- ইজারাপ্রাপ্ত অর্থ জনকল্যাণের জন্যে ওয়াকফ করা থাকলে তার ওপর যাকাত আরোপিত হবে না। তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্য, যেমন : বিয়েশাদি, ঋণ পরিশোধ, বসবাসের বাড়ি নির্মাণ, অথবা অন্য কোনো ব্যয়ের জন্যে নির্ধারণ করা থাকলে তাতে যাকাত আরোপিত হবে। তবে বছরপূর্তির পূর্বে এ অর্থ ব্যয় হয়ে গেলে তাতে যাকাত আসবে না।

ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনার যাকাত নির্ধারণের নীতিমালা

১) ইজারাপ্রাপ্ত আয়, বৃদ্ধি বা উৎপাদনের ওপর সরাসরি যাকাত ধার্য হবে।

২) আয়, বৃদ্ধি বা ফলন বছরান্তে হিসেব করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারাপ্রাপ্ত উপার্জন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক যা-ই হোক না কেন, এতে যাকাতযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হবে না।

৩) ইজারাপ্রদত্ত সম্পদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ভ্যাট-ট্যাক্স ইত্যাদি যাবতীয় খরচাদি বাদ দিয়ে নেট বার্ষিক আয়ের ওপর যাকাত ধার্য হবে।

৪) ইজারাপ্রাপ্ত অর্থের যাকাত প্রদান করা হবে নগদ অর্থে। কারণ ইজারাপ্রদত্ত ভূমির আয় বা উৎপাদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদ অর্থে হয়ে থাকে এবং নগদ অর্থ প্রদানে যাকাতগ্রহীতা সাধারণত অধিকতর লাভবান হয়। তবে ফসলের ভূমি উৎপাদিত ফসলের বিপরীতে ইজারা দেওয়া হলে ইজারাদাতা ফসলের মাধ্যমেও যাকাত প্রদান করতে পারেন।

দশম অধ্যায়
গবাদি পশুর যাকাত

গবাদি পশুর যাকাত

শুধু গবাদি পশুর ওপর যাকাত ফরজ। যে পশুগুলোর ওপর যাকাত ফরজ তা হলো—উট, গাভী, মহিষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। তবে পাখি, মুরগি, খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণীতে যাকাত নেই, তার সংখ্যা যত বেশিই হোক। অবশ্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গৃহীত ডেইরি, পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। গৃহপালিত পশুর ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এসব পশু প্রাকৃতিক চারণভূমিতে লালিত-পালিত হবে, অথবা সেগুলোকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে পশুর নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ ও বছরপূর্তি হওয়া আবশ্যক। পশুর যাকাত পশু দিয়ে দেওয়াই উত্তম, তবে আধুনিক প্রেক্ষাপটে অর্থের বিনিময়ে দেওয়া সহজ।

পশু যাকাতযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি

১. **নিসাব পরিমাণ হওয়া :** নিসাবের জন্য ইসলামি শরিয়াহ পশুর একটি সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০টি, গরু, মহিষ ইত্যাদি ৩০টি এবং উট ৫টি; এর কম হলে যাকাত নেই।

২. **চন্দ্রবর্ষ পূর্ণ হওয়া :** গবাদি পশু পূর্ণ এক চন্দ্রবর্ষ ব্যক্তির মালিকানায় থাকতে হবে। পশু গণনার সময় বাচ্চা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে; বাচ্চাদের আলাদা করে যাকাতের হিসাবের আওতায় আনা হবে না। কিন্তু যদি সব পশু বাচ্চাবয়সী হয় এবং নিসাব সংখ্যায় পৌঁছে যায়, তাহলে বাচ্চারও যাকাত দিতে হবে; তবে কেউ বলেছেন, বড় পশু কিনে যাকাত দিতে হবে।

৩. **যাকাতের পশু সায়েমা হওয়া :** যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে সায়েমা বলে। বছরের অধিকাংশ সময় মালিক নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে খাওয়ালে সে পশুর যাকাত নেই।

যেসব গবাদি পশু মালিকের কেটে আনা ঘাস খায়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর ব্যবসার জন্য লালিত-পালিত পশু ব্যবসায় পণ্য বিবেচিত হবে, তাদের লালন-পালন যেভাবেই হোক না কেন।

লক্ষণীয় যে, কেউ যদি নিজের জমি চাষ করার জন্য পশু পালন করে তাতে যাকাত নেই; কারণ এগুলো সায়েমা নয়। এ ধরনের গৃহপালিত পশু ব্যবহারের আসবাবপত্রের বিধানের আওতাধীন। শুধু সায়েমা বা যেসব পশু মাঠে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে চরে বেড়ায় এবং বছরের অধিকাংশ দিন প্রাকৃতিক ঘাস ও তৃণলতা খায় সেসবই যাকাতের আওতাধীন।

গবাদি পশুর যাকাতের নিসাব

নিম্নে গবাদি পশুর যাকাতের বিস্তারিত নিসাব ও পরিমাণ তুলে ধরা হলো—

উটের যাকাত : সায়েমা উটের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ যা ইসলামি শরিয়াহ নির্ধারণ করে দিয়েছে :

ক্রমিক	উটের সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
১.	১-৪টি	যাকাত প্রযোজ্য নয়।
২.	৫-৯টি	একটি বকরি : ছাগল বা মেষ
৩.	১০-১৪টি	দুটি বকরি
৪.	১৫-১৯টি	তিনটি বকরি
৫.	২০-২৪ ট	চারটি বকরি অথবা একটি উট
৬.	২৫-৩৫টি	বিনতু মাখাদ মাদী: একটি দুই বছরের উটনী
৭.	৩৬-৪৫টি	বিনতু লাবুন মাদী: একটি তিন বছরের উটনী
৮.	৪৬-৬০টি	একটি হিক্কাহ: একটি চার বছরের উটনী
৯.	৬১-৭৫টি	একটি জিয'আহ: একটি পাঁচ বছরের উটনী
১০.	৭৬-৯০টি	দুটি বিনতু লাবুন
১১.	৯১-১২০টি	দুটি হিক্কাহ

উটের সংখ্যা যদি ১২০টির বেশি হয়, তখন পরবর্তী প্রত্যেক ৪০টির জন্য একটি বিনতু লাবুন এবং প্রত্যেক ৫০টির জন্য একটি হিক্কাহ যাকাত প্রযোজ্য হবে। ন্যূনতম নিসাব পরবর্তী উটগুলোকে এভাবে ৪০ ও ৫০ সংখ্যায় ভাগ করে যাকাতের হিসাব করা হবে। উটের যাকাত উট দ্বারাই দেওয়া শ্রেয়। তবে মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে ও প্রয়োজনে উটের মূল্য দিয়েও যাকাত দেওয়া বৈধ।

(২) বকরির যাকাত : বকরি, মেষ, দুম্বা ইত্যাদির নিসাব ৪০টি। এসব পশুর যাকাতের হিসাব হলো :

ক্র.	বকরি/মেষ/দুম্বার সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
১.	১-৩৯টি	যাকাত প্রযোজ্য নয়
২.	৪০-১২০টি	১ বকরি/মেষ/দুম্বা
৩.	১২১-২০০টি	২ বকরি/মেষ/দুম্বা
৪.	২০১-৩০০টি	৩ বকরি/মেষ/দুম্বা

বকরি/মেষ/দুম্বা যদি ৩০০ থেকে অধিক হয়, তবে পরবর্তী প্রতি ১০০ সংখ্যা পূর্তিতে একটি করে বকরি/মেষ/দুম্বা যাকাত দিতে হবে। অতএব, ৪০০-৩৯৯ পর্যন্ত তিনটি বকরি/মেষ/দুম্বা ওয়াজিব হবে এবং পশুর সংখ্যা যখন ৪০০ হবে তখনই ৪টি বকরি/মেষ/দুম্বা ওয়াজিব হবে যা চলবে ৪৯৯টি পর্যন্ত। এভাবেই পরবর্তী হিসাব নির্ধারিত হবে। নিসাব পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বকরি/মেষ/দুম্বা আলাদাভাবে অথবা সব ক্যাটাগরির পশু একত্রিত হয়ে নির্ধারিত সংখ্যায় পৌঁছলেই বছরপূর্তি ও অন্যান্য শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে এসবের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

(৩) গরু/মহিষ/ষাঁড় ইত্যাদির যাকাত : গরু/মহিষ/ষাঁড় ইত্যাদির যাকাতের নিসাব ৩০টি পশু। এক্ষেত্রে নর-মাদী উভয় প্রকারের পশুর জন্যেই এ বিধান কার্যকর। প্রত্যেক ৩০টি গরুর জন্য বছরপূর্তি-সাপেক্ষে একটি তাবি' বা এক বছরের নর/মাদী' গরু/মহিষ/ষাঁড় যাকাত দিতে হবে এবং প্রতি ৪০টি গরু/মহিষ/ষাঁড়-এর জন্য একটি করে মুসিন্নাহ বা দুই বছরের গরু/মহিষ/ষাঁড় যাকাত দিতে হবে। পশু যত বেশি হোক ৩০ ও ৪০ দুটি সংখ্যায় ভাগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে :

ক্রম.	পশুর সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
১.	১-২৯টি	যাকাত প্রযোজ্য নয়
২.	৩০-৩৯টি	১টি তাবি' বা তাবিআহ (১ বছরের গরু/মহিষ/ষাঁড়)
৩.	৪০-৫৯টি	১টি মুসিন্নাহ (২-বছরের গরু/মহিষ/ষাঁড়)
৪.	৬০টি	৬০=(৩০*২)= ২টি তাবি'/তাবি'আহ (নরমাদী)
৫.	৭০টি	৭০=(৩০+৪০)= ১টি তাবি'আহ ও ১টি মুসিন্নাহ
৬.	১০০টি	১০০=(৩০*২)+৪০= ২টি তাবিআহ ও ১টি মুসিন্নাহ

মহিষ ও ষাঁড় গরুর নিসাবের আওতাধীন। যাকাত গণনার সময় মালিক গরু, ষাঁড় ও মহিষ প্রত্যেকটি যোগ করবে এবং নিসাব ও বছরপূর্তি-সাপেক্ষে যাকাত দেবে।

(৪) যৌথ মালিকানাধীন পশুর যাকাত

১. যৌথ মালিকানা পশুর যাকাতে ভূমিকা রাখে। যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যৌথ মালিকানাধীন পশুগুলোকে বিভক্ত করা যাবে না, যাতে পশুর সংখ্যা যাকাতের নিসাবের বহির্ভূত হয়ে পড়ে, আবার জোরপূর্বক যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন পশুগুলোকে একত্রিত করা যাবে না, যাতে পশুর সংখ্যা যাকাতের নিসাবাধীন হয়। যাকাত আরোপ অথবা যাকাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য এরূপ বাহানা করা হারাম।

২. যদি কয়েকজন মালিক তাদের পশুগুলো একসাথে লালন-পালন করেন, তবে সকল মালিকের পশু একত্রিত করে নিসাব পূর্ণতা ও বর্ষপূর্তি-সাপেক্ষে যাকাত প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক নিসাব গণনা করা হবে না। ফলে ৪০টি বকরির মালিক একাধিক ব্যক্তি হলেও তারা সম্মিলিতভাবে ১টি ছাগল যাকাত দেবেন।

৩. একাধিক মালিকানাধীন পশুর যাকাত নির্ধারণের জন্যে শর্ত হলো :

ক) সকল মালিক মুসলিম, স্বাধীন ও পশুর পূর্ণ মালিক হতে হবে,
খ) একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশুগুলো নিসাব পরিমাণ হতে হবে

এবং গ) একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশুগুলো একসঙ্গে পূর্ণ এক বছর পালিত হতে হবে।

(৫) যাকাত হিসেবে প্রদত্ত পশুর গুণাবলি : গৃহপালিত পশুর মালিক যেসব পশু যাকাত প্রদান করবে অথবা যাকাত আদায়কারী এক্ষেত্রে যা গ্রহণ করবে, তাতে নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা আবশ্যক :

১. **ত্রুটিমুক্ত হওয়া :** পশুর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত, অঙ্গহীন, জীর্ণশীর্ণ, ক্রয়-বিক্রয়ে অযোগ্য এবং কুরবানি বৈধ নয় এমন পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা যাবে না। কারণ, তাতে যাকাতের হকদার বা দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২. **শরিয়াহ কর্তৃক নির্দেশিত বয়সের হওয়া :** হাদীসে নির্দেশিত বয়সের পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করতে হবে। নির্ধারিত বয়সের তুলনায় কম বয়সের পশু দিয়ে যাকাত দিলে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর বেশি বয়সের পশু দিয়ে যাকাত দেওয়া হলে পশুর মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে পশুর মালিকের নিকট হাদীসে নির্দেশিত বয়সের পশু না থাকলে তিনি তার নিকট বিদ্যমান পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করবেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ অতিরিক্ত প্রদান করবেন।

৩. **মধ্যম মানের পশু হওয়া :** যাকাত উসুলকারী জন্য সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর পশু যাকাত হিসেবে উসুল করা যাকাত আদায়কারীর জন্য বৈধ নয়। যেমন : বেশি বাচ্চাদানকারী অথবা বেশি মোটাতাজা অথবা গর্ভবতী পশু।

(৬) ডেইরি, পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারসহ গৃহপালিত অন্যান্য পশুর যাকাত

অতীতে বর্তমান যুগের মতো করে ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম বা মৎস্য খামারের প্রচলন ছিল না। তাই আধুনিক কালের এরূপ খামারের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে মধু বা গুটি পোকা কর্তৃক উৎপাদিত রেশমের যাকাতের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

ডেইরি, পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারের যাকাতের মূলনীতি

১) ডেইরি ফার্মের গবাদি পশু দুগ্ধ, ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালিত হলে এসব পশু পণ্য উৎপাদক পর্যায়ভুক্ত। তাই এসবের যাকাত দিতে হবে না। তবে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত দিতে হবে।

২) পশু মোটাতাজা করে বিক্রির জন্য পালিত হলে তার যাকাত দিতে হবে।

৩) পোল্ট্রি ফার্মের হাঁস-মুরগি যদি ডিম বিক্রি বা বাচ্চা ফোটানোর জন্য পালিত হয়, তবে হাঁস-মুরগির যাকাত দিতে হবে না; বরং ডিম বা বাচ্চার যাকাত দিতে হবে।

৪) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ফার্মের ব্রয়লার/বাচ্চা উৎপাদন বা লালন পালন করলে এসব ব্রয়লারের যাকাত দিতে হবে।

৫) মৎস্য খামারে রেনু বা পোনা বিক্রির জন্য পালিত মাছের যাকাত দিতে হবে না, তবে রেনু বা পোনার যাকাত দিতে হবে।

৬) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ করলে তার যাকাত দিতে হবে। পরিবারের খাবারের জন্য চাষকৃত মাছের যাকাত দিতে হবে না।

৭) যেসব গবাদি পশু পালন বা মাছ চাষ করা হয় মৌলিকভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহারের জন্যে, সেগুলোতে যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

(৮) আধুনিক প্রেক্ষাপটে গবাদি পশুর যাকাত সম্পর্কে মৌলিক মাসায়েল

১) **খেতখামার ও গাড়ি টানা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত পশু :** যেসব গবাদি পশু যেমন : গরু, বলদ, মহিষ, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি খেতখামারের কাজে, গাড়ি টানার জন্য, অথবা বোঝা বহনের নিমিত্তে প্রতিপালন করা হয়, সেগুলোর সংখ্যা যতই হোক, তার ওপর যাকাত প্রযোজ্য নয়।

২) **ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু :** যেসব গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি চতুষ্পদ প্রাণী ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য বলে পরিগণিত হয়ে যাকাতযোগ্য হবে। যাকাত হিসাব করার দিন ব্যক্তি এসব পশুর বাজারমূল্য ধরে নিসাব ও বর্ষপূর্তি-সাপেক্ষ আলাদা করে অথবা অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত পরিশোধ করবেন। পশু ক্রয় করার সময় যদি বিক্রয়ের নিয়ত না থাকে, কিন্তু পরে বিক্রয়ের নিয়ত করা হয়, তবে নিয়ত পরিবর্তনের দিন থেকে বর্ষপূর্তির হিসাব কার্যকর হবে। তবে মূল পশু রেখে পশুর বাচ্চা বিক্রয়ের নিয়ত করলে বা পরবর্তীতে নিয়ত পরিবর্তন করে এরূপ সিদ্ধান্ত নিলে সেগুলো বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে না এবং যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

একাদশ অধ্যায়

উশর বা ফল ও ফসলের যাকাত

'উশর' শব্দটি আরবী 'আশারাতুন' (দশ) শব্দ হতে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ এক-দশমাংশ। পারিভাষিক অর্থে উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ এবং কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে নির্ধারিত খাতে দান করাকে 'উশর' বলে। সাধারণভাবে কৃষিজাত পণ্য, ফল-ফসলের যাকাতকে ইসলামি পরিভাষায় 'উশর' বলা হয়। হাদীসের পরিভাষায়, ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বদা 'উশর' বা 'নিসফু উশর', অর্থাৎ এক-দশমাংশ বা এক-দশমাংশের অর্ধেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক পানির মাধ্যমে উৎপাদন হলে এক-দশমাংশ এবং সেচের ওপর নির্ভরশীল ফসলের ক্ষেত্রে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করতে হয়। কিন্তু পরিভাষায় উশর মানেই ফসলের যাকাত।

উশর বা ফল ও ফসলের যাকাত : শরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সম্পদের যাকাত প্রদানের নির্দেশনার পাশাপাশি বিশেষভাবে ফসল ও ফলের যাকাত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল

কুরআনে বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ...

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা (যাকাত হিসেবে) ব্যয় করো।" সূরা বাকারা, ২ : ২৬৭

নবি করিম সা. বলেছেন, "আকাশের পানি, ঝরনা-খাল অথবা জমির আর্দ্রতা দ্বারা চাষ করা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ, আর সেচের পানি দ্বারা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত/উশর দিতে হবে।"—*সুনানে আবু দাউদ*

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, "জমিনে উৎপাদিত পচনশীল ও সংরক্ষণযোগ্য সকল ফল-ফসলেরই উশর অথবা নিসফু উশর দিতে হবে। যেমন : শাক-সবজি, আম, কলা ইত্যাদি।" তার মতে, পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, উশর বা নিসফু উশর সাব্যস্ত হবে।

উশর বা শস্য-ফসল ও ফলের যাকাত নির্ধারণের মৌলিক নীতিমালা

নিম্নোক্ত শর্তাবলির আলোকে ভূমির উৎপাদিত ফল-ফসলের ওপর উশর বা নিসফু উশর আরোপিত হবে—

১) **নিসাব পরিমাণ হওয়া :** উৎপাদিত ফল-ফসল নিসাব পরিমাণ হতে হবে, তবেই এরূপ ফল-ফসলের মালিককে উশর আদায় করতে হবে।

২) **ট্যাক্স, কর বাদ না দেওয়া :** জমির খাজনা, কর দিলেও উশর দিতে হবে। কেননা, কর ও খাজনা দেওয়া হয় সরকারিভাবে জমি জরিপ ও দেখাশোনা করার জন্য, আর উশর হলো ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত। অনেক জমিতে ফসল না হলেও খাজনা দিতে হয়। আবার অতীতে বিভিন্ন জমির খাজনাও দিতে হতো না। অতএব, কর ও খাজনা প্রদানকৃত ভূমির ফসলেও উশর আদায় অপরিহার্য।

৩) **উশর মৌসুমী, বার্ষিক নয় :** উশর উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। উৎপাদন না হলে উশর দিতে হবে না। অতএব, বছরে ফসল যতবার হবে ততবারই পৃথক পৃথকভাবে উশর আদায় করতে হবে, এমনকি বছরে ৪/৫ বার উৎপাদন দিলে ৪/৫ বারই উশর আদায় করতে হবে। কেননা, যাকাতের মতো উশরে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই। যদি কারো এক মৌসুমে ২০০ মণ ধান উৎপন্ন হওয়ার পর তিনি উশর পরিশোধ করে দেন, তাহলে উক্ত ফসল বছরের পর বছর ঘরে থাকলেও তাকে দ্বিতীয়বার ঐ উৎপাদনের উশর দিতে হবে না।

৪) **ভূমির সকল উৎপাদনে উশর প্রযোজ্য :** উৎপাদিত সকল ফল-ফসলের ওপরই উশর ফরজ। কাজেই জমির মালিক পাগল, ক্রীতদাস, নাবালগ, পরাধীন বা ওয়াকফকৃত যা-ই হোক না কেন উশর আদায় করতে হবে।

৫) **ইজারা বন্দোবস্ত, লিজ বা বন্ধকী জমির উশর :** যিনি জমি ইজারা, লিজ বা বন্ধক নিয়েছেন, তাকেই উশর প্রদান করতে হবে। কারণ, উশর উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, যিনি উৎপাদন করবেন ও উৎপন্ন

ফসল ভোগ করবেন, তিনিই উশর প্রদান করবেন। তবে দুজন মিলে চাষাবাদ করলে শর্তসাপেক্ষে উভয়ের ওপরই উশর ওয়াজিব হবে।

৬) **বর্গা প্রথা ও উশর :** এক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হলো জমির মালিক ও বর্গা চাষি প্রত্যেকে উৎপন্ন ফসলের নিজ অংশের উশর প্রদান করবেন।

৭) **উশর প্রযোজ্য নয় এমন ফল-ফসল :** পচনশীল, ওজনযোগ্য নয়, ঔষধ বা খোশবু তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন ফসলের উশর নাই। বসতবাড়ির আঙিনায় উৎপাদিত ফল-ফসল এবং অমুসলিমের ভূমির ফসলে উশর প্রযোজ্য হবে না।

৮) **ঋণ ও উশর :** ইমাম আহমাদ বলেন, "কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে তা পরিশোধ করবে এবং বাকি ফসলের যাকাত প্রদান করবে।" এটিই ইবনে আব্বাস রা.-এর অভিমত। তবে ইবনে উমর রা. বলেন, "কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে এবং নিজের পরিবারের জন্য যা খরচ করেছে তা প্রথমে পরিশোধ করবে। এরপর বাকি উৎপাদনের যাকাত প্রদান করবে।" অন্য মতে, ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে ঋণ ধর্তব্য নয়; বরং মোট উৎপাদনেরই যাকাত দিতে হবে। কারণ, উশরের ক্ষেত্রে রাসূল সা. ও খোলাফায়ে রাশেদিন কখনো ঋণ বাদ দেননি। তৎকালীন যাকাত সংগ্রহকারীগণ কখনো কাউকে প্রশ্ন করতেন না তাদের ঋণ আছে কি না অথবা কী পরিমাণ ঋণ আছে। অতএব, একজন মুমিন তার মোট উৎপাদনের উশর দেবেন।

৯) **উশরের উপাদান :** উশর ফসলের আকারেও দেওয়া যায় অথবা তার মূল্যও দেওয়া যায়।

১০) **উশরের খাত :** যাকাত যেসব খাতে ব্যয় করা হয়, উশর সেইসব খাতে ব্যয় করতে হবে।

১১) **উশরের পণ্য :** ফল, ফসল, মাছ, মধু, শাকসবজি, রেশমসহ বাংলাদেশের সকল ভূমিজ উৎপাদনের উশর প্রদান আবশ্যক। শর্ত হলো, ভূমিজ উৎপাদনসমূহ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী হতে হবে। অতএব, ধান, পাট, গম, আলু ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় কাঁচামাল, এমনকি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদিত শাকসবজি, ফল-ফলাদি ও বাঁশেও উশর আসবে।

১২) **পচনশীল পণ্যে উশর :** ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে, "রেখে দেওয়া যায় না, এমন টাটকা ব্যবহার্য শাকসবজির ওপর উশর নেই। অনুরূপভাবে পশুর খাবার ও খড়ির ওপরও কোনো উশর নেই।"

উশরের নিসাব ও পরিমাণ

পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ফসলে যাকাত নেই। আধুনিক পরিমাপ অনুসারে, পাঁচ ওয়াসাক হলো প্রায় ৯৪৮ কেজি বা প্রায় ২৫ মণ। ব্যক্তির ভূমিজ উৎপাদিত গম ও যব আলাদাভাবে নিসাব পূর্ণ না হয়ে উভয় প্রকারের ফসল একত্রে ৫ ওয়াসাক হলেও তার উশর দিতে হবে। অনুরূপভাবে যদি গম, যব, ধান, খেজুর ও কিশমিশ প্রত্যেক আইটেম এক ওয়াসাক করে উৎপাদিত হয় এবং সব মিলে পাঁচ ওয়াসাক পূর্ণ হয়, তাহলেও যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে কম হলে তার যাকাত দেওয়া জরুরি নয়।

পাঁচ ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাপ

সকল পর্যালোচনায় প্রমাণিত যে, ১ ওয়াসাক = ৬০ সা'। এক্ষেত্রে সকলেই একমত। কিন্তু আরবী 'সা'-এর পরিমাপ নির্ধারণে মতভেদ লক্ষণীয়—

১) ইমাম আবু হানীফা র. ও তাঁর অনুসারীগণ ইরাকি 'সা'-কে স্ট্যান্ডার্ড ধরেন। সে হিসাবে '১ সা = ৮ রতল। সুতরাং ৬০ সা' (১ ওয়াসাক) = ৪৮০ রতল। তাহলে ৫ ওয়াসাক = ২৪০০ রতল। 'রতল' হচ্ছে আরবী পরিমাপের সর্বনিম্ন একক। অধিকাংশ আধুনিক গবেষণামতে, আধুনিক মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে ১ রতল = ৪১২.১ গ্রাম। সুতরাং ২৪০০ রতল = ৯৮৯০৪০ গ্রাম বা ৯৮৯.০৪ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ প্রায় ২৫ মণ।

২) অন্যরা মাদীনায় প্রচলিত 'সা'-কে স্ট্যান্ডার্ড ধরেছেন। তাদের হিসাবে, এক সা' সমান হলো পাঁচ রতল ও এক রতলের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৫.৩৩৩...রতল। তাহলে ৬০ সা' (১ ওয়াসাক) = ৩১৯.৯৮ রতল। সুতরাং তাহলে ৫ ওয়াসাক = ১৫৯৯.৯ রতল। ১ রতল = ৪১২.১ গ্রাম। সুতরাং ১৫৯৯.৯ রতল = ৬৫৯৩১৮.৭৯ গ্রাম, বা ৬৫৯.৩১৮৭৯ কেজি, যা প্রায় যা প্রায় ১৭ মণ।

সার্বিক পর্যালোচনায় বোঝা যায়, ফল-ফসলের যাকাতের নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি মত রয়েছে :

১) আবু হানীফা র.-এর মতে, ফল-ফসলের কোনো নিসাব নেই; অল্পবেশি যা-ই হোক যাকাত আদায় আবশ্যক।

২) হানাফি মাযহাবের অন্য ইমামদের মতে, ভূমির উৎপাদন কমপক্ষে ৯৯০ কেজি (প্রায় ২৫ মণ) হলে তাতে যাকাত ফরজ হবে।

৩) অন্যান্য আলেমদের মতে, ভূমির উৎপাদন ৬৫৯ কেজি (প্রায় ১৭ মণ) বা তার বেশি হলেই যাকাত আদায় করতে হবে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী হানাফি মত অনুসরণ করেন বিধায় তারা প্রথম মতকেই উশরের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এ মতটি সাবধানতাপূর্ণ এবং হিসাবেও সহজতর।

শস্য-ফসল ও ফলের যাকাতের পরিমাণ

এ বিষয়ে উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে যে, সেচবিহীন উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত ১০%, আর সেচনির্ভর উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত ৫% হারে উশর দিতে হবে। তবে ফিকাহবিশারদগণ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে জমিতে সেচ-সার, কীটনাশক ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক উপায়ে ফসল উৎপাদিত হয় তার উশর ফসলের ১০% বা দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে জমিতে সেচ-সার, কীটনাশক ইত্যাদিসহ আধুনিক উপায়ে ফসল উৎপাদিত হয় তার উশর ফসলের ২০% বা বিশ ভাগের এক ভাগ।

মধু ও তরল পণ্যের যাকাত

মধু চাষ করলে তার উশর প্রদান করতে হবে। আবু সাইয়ারা রা. থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে—"আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু মৌমাছির চাষ আছে। তিনি বললেন, তুমি (উৎপাদিত মধুর) উশর আদায় করবে।" এ ছাড়া যাইতুনের উশর প্রদানের বিষয়েও কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মধু ও অন্যান্য তরল দ্রব্যের নিসাব : আধুনিক গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, মধু বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে লিটারের হিসাবে ইমাম মুহাম্মাদ র.-এর মতানুসারে এক 'সা' প্রায় ৪.১২ লিটার হয়। তাহলে ৬০ 'সা' (১ ওয়াসাক) = ২৪৭.২ লিটার। সুতরাং ৫ ওয়াসাকে হবে ***১২৩৬ লিটার***। এটাই নিসাব। আর ইমাম আবু ইউসুফ, মালিক, শাফেয়ি ও আহমাদ র.-এর মতে এক 'সা'

প্রায় ২.৭৫ লিটার। সে হিসাবে ৫ ওয়াসাকে ***৮২৫ লিটার*** হয়। সুতরাং উল্লিখিত পরিমাণে চাষ হলে এক দশমাংশ উশর হিসেবে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যাবতীয় ব্যয় ও শ্রমের মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থেকে উশর দিতে হয়।

প্রাণীজাত সম্পদের যাকাত

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর মতে—"প্রাণীজাত সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাতের মূলনীতি হচ্ছে, যার মূল্যের ওপর যাকাত ধার্য নয়, তার উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে যাকাত ধার্য হবে। যেমন : জমির উৎপাদন হলো কৃষি ফসল, মৌমাছির উৎপাদন হলো মধু, চতুষ্পদ জন্তুর উৎপাদন হলো দুগ্ধ, মুরগি থেকে আসে ডিম এবং গুটি পোকা থেকে উৎপাদিত হয় রেশম। সুতরাং প্রাণীজাত দ্রব্যাদির ওপর এ হিসেবেই যাকাত দিতে হবে।"

খারাজী ভূমির যাকাত

মুসলিম ফকিহগণ ভূমিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, উশরি ও খারাজী। উশরি ভূমির উৎপাদনের ওপরই উশর প্রযোজ্য; খারাজী ভূমির উৎপাদনের ওপর উশর প্রযোজ্য নয়। মুসলিম পণ্ডিতগণ নিম্নোক্ত ভূমিগুলোকে খারাজী ভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

১) যে ভূমি মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের পর মুসলমানদের মাঝে বণ্টন না করে অমুসলিমদের কাছে রেখে দিয়েছেন;

২) সন্ধির মাধ্যমে বিজিত এলাকার ভূমি;

৩) অমুসলিম কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে, চাই তা উশরি ভূমির পাশে হোক বা খারাজী ভূমির পাশে হোক;

৪) মুসলমান খারাজী ভূমির পাশের অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে;

৫) অমুসলিমদের কাছ থেকে ক্রয়কৃত ভূমি।

খারাজী ভূমি কখনো উশরি ভূমিতে পরিণত হবে না। তবে উশরি ভূমি খারাজীতে পরিণত হতে পারে। যেমন মুসলমান থেকে জিম্মি উশরি ভূমি ক্রয় করলে তা খারাজী ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। খারাজী জমির উৎপাদিত ফসলের উশর ওয়াজিব হবে না। এ ছাড়া অন্য সকল জমি উশরি এবং এগুলোর ওপর উশর প্রযোজ্য।

উশরি ভূমির যাকাত

কোনো ভূমি কীভাবে উশরি সাব্যস্ত হয়—

১) কোনো ভূমির মালিক স্বেচ্ছায় মুসলিম হলে তার ভূমি উশরি হয়ে যায়।

২) মুসলিম সেনাপতি কোনো অমুসলিম এলাকা বিজয়ের পর সে এলাকার জমি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলে।

৩) কোনো অনাবাদী জমি যদি কোনো মুসলিম আবাদ করে, তবে পার্শ্ববর্তী জমিটি উশরি হলে আবাদকৃত নতুন জমিটিও উশরি বলে সাব্যস্ত হবে।

৪) মুসলিমদের থেকে উশরি জমি কিনলে তা উশরি হিসেবেই থেকে যাবে।

৫) যে ভূমির অবস্থা জানা নেই, তাও উশরি বলে গণ্য হবে।

উশরি জমির প্রকারভেদ : নিম্নোক্ত জমিসমূহ উশরি জমি হিসেবে গণ্য হয় :

১. সমস্ত আরব দেশ।

২. যে দেশের লোকজন সানন্দে মুসলিম হয়েছে।

৩. যে দেশ বিজয় করার পর মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

৪. সেই পতিত জমি যা উশরি পানি দ্বারা সেচ দিয়ে চাষাবাদযোগ্য করা হয়েছে।

৫. সেই খারাজী ভূমি যা উশরি পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়েছে।

৬. কোনো মুসলিম যদি তার ঘরকে বাগানে পরিণত করে উশরি পানি দ্বারা সিঞ্চিত করে।

জমির খাজনা ও উশর

অনেকে ধারণা করেন যে, বাংলাদেশের জমির খাজনা বা কর দিতে হয় বিধায় এদেশের জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে না। জেনে রাখা দরকার, খাজনা বা কর এবং খারাজ এক জিনিস নয়। কারণ, খারাজী জমির তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন :

১. তা বিজিত অমুসলিম নাগরিকদের জমি হতে হবে।

২. ফিকহের দৃষ্টিতে খারাজ হবে উশরের চেয়ে পরিমাণে বেশি।

৩. ইসলামি সরকার খারাজ আদায় ও ইসলামি বিধানমতো ব্যয় করবে।

এ তিন শর্তের কোনোটিই আমাদের দেশে পূর্ণ হয় না। অতএব, এখানে জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে না—এ বক্তব্য সঠিক নয়; বরং বাংলাদেশের জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে।

উশর ব্যয়ের খাত

উশর যেহেতু ফসলের যাকাত, তাই এর বণ্টন ও ব্যয়ের খাতে যাকাতের বণ্টন ও ব্যয়ের খাত থেকে পার্থক্য করার কিছু নেই। উশর ও যাকাত আল্লাহর নির্ধারিত ৮টি খাতেই শুধু ব্যয় করা যাবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
অন্যান্য সম্পদের যাকাত

(ক) গুপ্তধনের যাকাত

অধিকাংশ আলেম বলেছেন, গুপ্তধন বলতে জমিনে পুঁতে রাখা সকল সম্পদকে বোঝানো হয়, যেমন : প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, স্বর্ণ, রুপা, সীসা, পিতল, বাসন-কোসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র। তবে তা জাহিলি যুগের হওয়া শর্ত, অর্থাৎ নিশ্চিত হতে হবে যে, গুপ্তধন ইসলামের পূর্বযুগে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। গুপ্তধনের গায়ের তারিখ ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে তা অনুমান করা যেতে পারে। কেউ যদি নিজের জমি খনন করতে গিয়ে তার সন্ধান পায় কিংবা ঘরের খুঁটি অথবা কূপ অথবা কোনো খনন কাজে বেরিয়ে তা হলেই তাকে 'গুপ্তধন' বলা হবে।

গুপ্তধন প্রসঙ্গে শর্তাবলি : গুপ্তধন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে :

(১) যদি গুপ্তধন বের করতে টাকা-পয়সা ব্যয় হয়, তখন সেটি গুপ্তধন থাকবে না; অন্যান্য সম্পদের ন্যায় সাধারণ সম্পদ বলে গণ্য হবে।

(২) গুপ্তধন পাওয়া জমি যার নিকট থেকে কেনা হয়েছে, গুপ্তধনের সম্পদ তারই—এমন কোনো প্রমাণ থাকলে ওই গুপ্তধন তাকে (পূর্বের মালিককে) ফেরত দেওয়া হবে। আর তিনি তার যাকাত আদায় করবেন।

(৩) জমি যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হয়, আর রাষ্ট্র কাউকে লিজ বা ভাড়া দেয়, তাহলে রাষ্ট্রকে গুপ্তধন ফেরত দেওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে।

(৪) যদি জানা যায় গুপ্তধন ইসলাম বিকাশ লাভ করার পর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে, তাহলে তা গুপ্তধন বলে বিবেচিত হবে না, বরং কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

(৫) এমন কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে তার প্রাপ্তির কথা এক বছর ঘোষণা করা হবে, যেন মালিক পর্যন্ত ঘোষণা পৌঁছে যায়। যদি নিদর্শন দ্বারা মালিকের পরিচয় পাওয়া যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। অন্যথায় সে নিজেই তার মালিক হবে এবং নিসাব বরাবর হলে তার যাকাত দেবে, কারণ এটি জাহিলি যুগের গুপ্তধন নয়।—*আশ-শারহুল মুমতি ৬/৯৬-৯৭*

গুপ্তধন থেকে যাকাত দেওয়ার পরিমাণ : নবি সা. বলেছেন, وفي الرِّكَازِ الخُمس "গুপ্তধনের যাকাত এক-পঞ্চমাংশ।"—*সহিহ বুখারী ও মুসলিম*

যে গুপ্তধন পাবে সে গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেবে। অধিকাংশ আলেম বলেছেন : যে গুপ্তধন পাবে তার দায়িত্ব এক-পঞ্চমাংশ যাকাত বের করা, সে মুসলিম হোক বা মুসলিম দেশে বসবাসকারী যিম্মি হোক। গুপ্তধনের প্রাপককে মুসলিম শাসক বাধ্য করবেন, যেন রাষ্ট্রের নিকট এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হস্তান্তর করে; সে ছোট, বড়, সুস্থ বা পাগল যাই হোক। আরেকটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় পাঁচভাগ থেকে অবশিষ্ট চার ভাগ প্রাপকের হক।

গুপ্তধনের নিসাব : হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বলে, গুপ্তধনে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিসাব শর্ত নয়। অধিকাংশ আলিমের মতও তা-ই। অতএব, যে জাহিলি যুগের গুপ্তধন পাবে, সে তার এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেবে, পরিমাণ কমবেশি যাই হোক।

এক-পঞ্চমাংশ গুপ্তধনের হকদার : গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাতের আট খাতে ব্যয় করবে, না গনীমতের ন্যায় জনস্বার্থে ব্যয় করবে—এ বিষয়ে হাদীসে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এক-পঞ্চমাংশ জনস্বার্থে ব্যয় করবে। অর্থাৎ মুসলিম শাসক তার খাত নির্ণয় করবে, যেখানে স্বার্থ দেখবে সেখানে ব্যয় করবে।—*তামামুল মিন্নাহ ফিত-তালিক আলা ফিকহিস সুন্নাহ : ২৭৮*

গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার সময় : গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়; যখন পাবে তখনই তার এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেবে, এতে কারো দ্বিমত নেই।

(খ) কারেন্সি নোটের যাকাত

কারেন্সি নোটে বাহককে উৎকীর্ণ মূল্য (face value) পরিশোধের প্রতিশ্রুতিসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত খাজাঞ্চি কর্মকর্তার স্বাক্ষর সন্নিবেশিত থাকে।

কোনো ব্যক্তির নিকট যদি কারেন্সি নোটরূপে নিসাব পরিমাণ সোনা বা রুপা ক্রয়ের পরিমাণ টাকা থাকে, তবে প্রতি চন্দ্রবছর তার যাকাত আদায় করবে।

(গ) স্থির সম্পত্তি (fixed property) হতে প্রাপ্ত আয়ের যাকাত

কোনো ব্যক্তি তার স্থির সম্পত্তি হতে আয় করলেও, সমস্ত আয় যদি ঐ বছরের মধ্যেই খরচ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর যাকাত আদায় করতে হয় না। তবে ওই আয় থেকে তিনি সঞ্চয় করতে পারলে, সঞ্চয় নিসাব পরিমাণ হওয়া ও চন্দ্রবছর অতিক্রম হওয়া সাপেক্ষে তা যাকাতযোগ্য হবে।

(ঘ) অস্থিতিশীল (Fluctuating) সম্পদের যাকাত

ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির নিকট পয়লা রমজানে নিসাব পরিমাণ সম্পদ ছিল। আর পরবর্তী বছর পয়লা রমযানেও নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু মাঝে কোনো একসময় কিছু অংশ ব্যয় করার কারণে তার সম্পদ নিসাব পরিমাণ থেকে কমে গেলেও পরে তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

(ঙ) তৈজসপত্রের যাকাত

কোনো ব্যক্তির নিকট দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যদি সোনা বা রুপার তৈজসপত্র থাকে এবং তার ওজনমূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তবে তাকে প্রতিবছর সোনা-রুপার হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

(চ) পোশাক-পরিচ্ছদের যাকাত

মূল্য ও পরিমাণ নির্বিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ যাকাতের আওতাবহির্ভূত। তবে পোশাক-পরিচ্ছদে যদি সোনা-রুপার সূচিকর্ম বা এসব ধাতুতে নির্মিত সুতোর ব্যবহার থাকে এবং এরূপ সোনা-রুপার ওজন যদি নিসাব পূর্ণ করে তবে সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর জন্য প্রতি চন্দ্রবছরে যাকাত আদায় করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

"নিশ্চয়ই যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন এবং তা দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এ হলো আল্লাহ তায়ালার বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *সূরা তাওবা, ৯ : ৬০*

আল কুরআনে যাকাতের প্রাপক হিসেবে ৮টি খাতের উল্লেখ থাকলেও তাদের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা, কোনো খাতে কতটুকু বরাদ্দ করতে হবে, কোনো দ্রব্যে বা কী পদ্ধতিতে দিতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে রাসূল সা. তাঁর সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রমবিন্যাস, বঞ্চনার বৈচিত্র্য, শ্রম, পুঁজি ও পণ্যের বাজার, উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের ওপর বিবেচনা করে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় সমাধান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ কুরআনের text এবং হাদীসের Context থেকে কিছু ব্যাখ্যা ও মূলনীতির আলোকে তাদের যুগের উপযোগী সংজ্ঞা এবং তার প্রায়োগিক ক্ষেত্র তৎকালীন মানবীয় প্রয়োজন, দক্ষতা ও সামর্থ্যের আলোকে নির্ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

তারা আল কুরআনে উল্লেখিত ৮টি খাতই মূল এবং এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো তার সমসাময়িক ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার কিছু মূলনীতি হিসেবে দেখেছেন।

যাকাত বিতরণের খাতসমূহ :

প্রথম ও দ্বিতীয় খাত : ফকির ও মিসকিন

ফকির ও মিসকিন শব্দদুটো দারিদ্র্যকে প্রকাশ করে। ফকির হলো যার কিছু সম্পদ আছে। আর মিসকিন হলো যার কিছুই নেই।

১) যাদের অর্থ-সম্পদ নেই এবং নিয়মিত বা অনিয়মিত উপার্জনে অক্ষম তারা যাকাত প্রাপক।

২) যাদের কর্মসংস্থান আছে, কিন্তু তা দিয়ে অন্নসংস্থান বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না, তারাও যাকাত প্রাপক।

৩) যাদের আয় আছে এবং তা দিয়ে তাদের মৌলিক প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে। কিন্তু তাদের এ আয় বা সম্পদ নিসাব পরিমাণের নিচে তারা যাকাত দেবে না; নেবেও না।

৪) যাদের সম্পদ নিসাবের চেয়ে বেশি তারা যাকাত দেবে।

ফকিরকে কী পরিমাণ যাকাত দেবে তার কোনো সীমা শরিয়াহ নির্ধারণ করে দেয়নি। তবে যতটুকু প্রদান করলে সে অভাবমুক্ত হয় ও নিজের প্রয়োজন মিটে যায়, সে পরিমাণ দেওয়াই শ্রেয়। খাত্তাবি র. বলেন, "যাকাত প্রদানের পরিমাণ যাকাত গ্রহণকারীর অবস্থা ও জীবিকার ওপর নির্ভর করে; সবার জন্য ধার্য করা নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। কারণ, যাকাত গ্রহণকারী সবার অবস্থা সমান নয়।"—*মাআলিমুস সুনান, ১/২৩৯*

তৃতীয় খাত : 'আমিলীন'

যাকাত ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাকাত তহবিলের অন্যতম প্রাপক। যদিও ব্যক্তিগতভাবে সকল সচ্ছল বিশ্বাসীকে যাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআনের নির্দেশনা এবং রাসূল সা.-এর সুন্নাহ অনুসারে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বাস্তবানুগ বলে প্রতীয়মান হয়; তা সরকারিভাবে হোক বা বেসরকারি।

যাকাত ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কোনো এক সচ্ছল সাহাবী যাকাতের অর্থ থেকে কোনো অংশ নিতে অস্বীকার করলে রাসূল সা. তাঁকে জোর করে তা দিয়ে বলেন—"তুমি এটি গ্রহণ করো এবং এটি যদি তোমার প্রয়োজনে না লাগলে অন্য কাউকে দান করে দাও।" অধিকাংশ আলেম ব্যবস্থাপনা ব্যয় উত্তোলিত মোট যাকাতের ১২.৫% ভাগ বা এক-অষ্টমাংশের বেশি না হওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন।

যাকাত উসুলকারীদের গুণাবলি :

ক) বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যাকাত উসুলকারী মুসলিম হওয়া জরুরি। কারণ, মুসলিমদের থেকে যাকাত উসুল করা মানে তাদের ওপর একপ্রকার কর্তৃত্ব করা, যেমন এতে প্রভাব খাটানো, কর্তৃত্ব করা ও বলপ্রয়োগ করার ইখতিয়ার থাকে। কোনো অমুসলিমকে মুসলিমদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেওয়া যায় না।

খ) সাবালক ও বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া।

গ) আমানতদার হওয়া।

ঘ) যাকাত উসুল করার যোগ্য হওয়া। যেমন : সত্যবাদী ও নেককার হওয়া।

ঙ) যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইলম থাকা।

চতুর্থ খাত : মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (অন্তর জয় করার জন্য)

'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' মানে 'তাদের ঝুঁকে যাওয়া অন্তরকে' যাকাতের একটি অংশ দাও। কোনো অমুসলিমের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা জরুরি বিবেচিত হলে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ। যাদের যাকাত দিলে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইমান শক্তিশালী হবে অথবা যাদের যাকাত দিলে মুসলিমদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ। ইমাম যুহরি র.-কে الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন, 'ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারীগণ। তাকে প্রশ্ন করা হলো, যদি তারা ধনী হয়? তিনি বললেন, যদিও ধনী হয়।'—*ইবনে আবি শায়বাহ, ৩/২২৩*

পঞ্চম খাত : রিকাব (শৃঙ্খলমুক্ত করা)

'রিকাব' শব্দটি রাকাবাহ *(رقبة)* শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলা। আল্লাহ তায়ালার বাণী وَفِي الرِّقَابِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দাস-দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা; দাস-দাসীকে সম্পদ দেওয়া নয়। এ খাত নিম্নের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে—

১) যেসব দাস-দাসী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার শর্তে মনিবের সাথে মুক্তির চুক্তি করেছে;

২) দাস-দাসী খরিদ করে মুক্ত করা وَفِي الرِّقَابِ-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩) বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী শত্রুদের হাতে বন্দি মুসলিমদের মুক্ত করার জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে।

৪) ইসলামি পণ্ডিতদের মতে, কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন সমগ্র পৃথিবীতে দাসত্ব প্রথা ছিল। তখন জীবিকার অন্য কোনো পথ না থাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বাধ্য হয়ে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে পরাধীন হয়ে পড়ত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ প্রথার বিবর্তন ঘটেছে।

সুতরাং এখন ভূমিদাস, (ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেসব শ্রমিক শ্রম, শ্রমের যাবতীয় ব্যবহার, শ্রম প্রচেষ্টার ফলাফলে ভূ-স্বামীর ইচ্ছাধীন), শ্রমদাস (উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাদের শ্রম, শ্রমের ব্যবহার, ক্ষেত্র, শ্রম প্রচেষ্টায় বাধ্য হয়ে পুঁজিপতির ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত), যৌন দাস, পণবন্দি, মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি, মানব পাচারের শিকার, বাধ্য হয়ে সৈনিক হওয়া শিশু ও নারী, শিশু ও নারী শ্রমিক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ খাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

ষষ্ঠ খাত : গারিমীন (ঋণমুক্ত করা)

'গারিমীন' শব্দটি বহুবচন। একবচন হলো غارم অর্থ ঋণী। এখানে ঋণী বলতে মূলত গরিব ও অভাবী মুসলিম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। একজন উপার্জনশীল হোক বা বেকার হোক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তখনই গরিব বা অভাবী বলা যাবে, যখন তার নীট সম্পদ (Asset-Laibilities/সম্পদ ও দেনার পার্থক্য) নিসাবের চেয়ে কম হয়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দুই প্রকার :

১) মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির ব্যবস্থা করার জন্যে হাদিয়া-তোহফা বা ইত্যকার আয়োজন করতে গিয়ে ঋণকারী ব্যক্তি। তারা ধনী হলেও তাদের যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে, যেন তিনি অভীষ্ট কাজকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন।

২) যে নিজের প্রয়োজনে ঋণ করেছে। যেমন : খাদ্যক্রয়, চিকিৎসা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ অথবা বিবাহ অথবা ঘরের আসবাবপত্র কেনার জন্য ঋণ করেছে। অনুরূপ যার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে সেও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অগ্নিকাণ্ড অথবা জলোচ্ছ্বাস অথবা মাটিতে ধসে যাওয়া ইত্যাদি। পুরনো ফার্নিচার নতুন করার জন্য ঋণ করলে এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ঋণগ্রস্তকে যাকাত দেওয়ার শর্তাবলি :

১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে সামর্থ্য নয়, যদিও তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় সম্পদ তার রয়েছে, কিন্তু জরুরি প্রয়োজন শেষে ঋণ পরিশোধ করার কোনো অর্থ থাকে না, এরূপ ব্যক্তিদের ঋণ যাকাতের অর্থ থেকে পরিশোধ করা বৈধ। যদি সে ঋণের একাংশ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় অবশিষ্টাংশ ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে যাকাত দেবে।

২) বৈধ কাজে ঋণীরাই যাকাতের হকদার, যে পাপের কাজে ঋণী হবে সে যাকাত পাবে না। যদি সে তাওবা করে এবং সত্যিকার তাওবার আলামত তার ভেতর স্পষ্ট হয়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। অনুরূপ কেউ যদি বৈধ কাজে প্রয়োজনের বেশি খরচ করে ঋণগ্রস্ত হয় তাকেও যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। ঋণের টাকা ঋণগ্রস্ত অথবা পাওনাদার যাকেই দেবে যাকাত আদায় হবে। যদি আশঙ্কা হয়, ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধ না করে যাকাতের টাকা নষ্ট করে ফেলবে, তাহলে সরাসরি পাওনাদারকে দেওয়াই উত্তম।

সপ্তম খাত : ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে ব্যয় করা)

'ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থ 'আল্লাহর পথে'। এ বিষয়ে কয়েকটি মত আছে—

১) আলেমগণ একমত যে, 'আল্লাহর রাস্তায়' মানে জিহাদ করা। অতএব, মুজাহিদ ও মুজাহিদদের অস্ত্রশস্ত্রের জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে, যদিও তারা ধনী হয়। অতএব, যুদ্ধের বিমান ঘাঁটি তৈরি করা, শত্রুদের সন্ধানদাতার বেতন ইত্যাদিও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। শাফেয়ি ও হাম্বলি ফকিহগণ শর্ত করেছেন যে, এমন মুজাহিদদের দেওয়া যাবে, যাদের জন্য সরকারি বেতন-ভাতা বরাদ্দ নেই।

২) হানাফি আলেমগণ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-এর ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপকতা আরোপ করে বলেছেন, কল্যাণকর প্রত্যেক খাতে যাকাত ব্যবহার করা বৈধ, যদিও এটি বেশ দুর্বল মত।

৩) ইবনে উমর রা., ইবনে তাইমিয়া র.-সহ একদল মনীষী মনে করেন, হজ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, হজ আল্লাহর রাস্তায় এক প্রকার জিহাদ।

৪) আধুনিক ইসলামি পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন, দীনের পথে যেকোনো বাধা মোকাবিলার জন্য এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ। তবে মসজিদ তৈরি, রাস্তা সংস্কার ইত্যাদির জন্য যাকাতের অর্থ খরচ করা বৈধ নয়; বরং এগুলোর জন্য ওয়াকফ, হেবা, ওসিয়ত ও সাদাকার মতো খাত থেকে খরচ করা যেতে পারে।

অষ্টম খাত : ইবনুস সাবিল

ইবনুস সাবিল মানে যে মুসাফির সফরে এসে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তিনি তার এলাকায় সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে দেওয়া যাবে। পথে পথিকের বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে যেতে পারে, বাড়িঘর হারিয়ে বা উচ্ছেদ হয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বসবাস করা আরম্ভ করতে পারে। নাগরিকত্বহীন অবস্থায় অভিবাসীদের বিভিন্ন দেশে যাযাবরের জীবন করতে হতে পারে। এ ধরনের সকল অর্থই 'ইবনুস সাবিল' দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয় :

১) জীবিকার সন্ধানে, শিক্ষা জন্য বা হজের সফরে মুসাফির ব্যক্তি সফরে থাকাকালীন অবস্থায় পাথেয় ফুরিয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে তাকে যাকাতের অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে।

২) বর্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বা অভিবাসনের উদ্দেশ্যে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়ার পর সেখানে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়লে বা নাগরিকত্ব না পাওয়ায় কর্মসংস্থানহীনতায় ভুগলে তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে জীবন নির্বাহ বা দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩) যে সকল মানুষ যুদ্ধ বা রাজনৈতিক সংকটে উদ্বাস্তু হয়েছেন এবং গৃহহীন মানুষ (পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ) যারা বিভিন্ন জায়গায়, রেল স্টেশনে, ফুটপাতে বা কারো বাড়ির আঙিনায় রাতদিন কাটিয়ে দেয়, তাদের জন্য আবাসন বা কোথাও স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়ায় যাকাতের অর্থ খরচ করা যেতে পারে।

৪) দুর্ঘটনা বা দুর্বিপাকে পড়ে অনেক মানুষ পথে বসে যাওয়ার উপক্রম হয়। অগ্নিকাণ্ড, ডাকাতি, বন্যা, নদীভাঙন বা কোনো স্থানে থাকার বা জীবিকার বৈধতা হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

ইবনুস সাবিল খাতে যাকাত দেওয়ার শর্তাবলি :

১) যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য মুসাফিরের সফর শরয়ি অথবা বৈধ হওয়া জরুরি। যদি পাপ কাজের উদ্দেশ্যে কেউ সফর হয় সে যাকাতের হকদার হবে না; তিনি যদি তাওবা করেন তাহলে অবশিষ্ট সফরের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

২) কেউ কাজের সন্ধানে অথবা বৈধ কারণে সফর করতে চায়, কিন্তু তার অর্থ নেই। শাফেয়ি মাজহাবের মতাবলম্বীরা বলেন, তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ। তবে অন্যান্য আলেমগণ বলেন, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না; কারণ 'ইবনে সাবিল' বা মুসাফির ভিনদেশি ব্যতীত কাউকে বোঝায় না। এটিই বিশুদ্ধ মত। এখানে একটি কথা বলা যায়, ফকির ও মিসকিনদের অংশ থেকে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, যদি সে গরিব হয়, যা যাকাতের একটি খাত।

বিশুদ্ধ মতে, ইবনে সাবিল বা মুসাফিরকে যদি ঋণ দেওয়ার মতো লোক থাকে, তবুও তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, তার জন্যও যাকাত নেওয়া বৈধ। যদি আগেই ঋণ নিয়ে নেয়, যাকাত নিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

যাকাত বণ্টনের পরিমাণ

১) ইমাম কুদুরির মতে, এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে যে প্রতিটি শ্রেণিকে যাকাত দেওয়া অথবা যেকোনো একটি শ্রেণিকে দেওয়া।

২) ইমাম শাফেয়ি র. বলেন, কমপক্ষে প্রত্যেক শ্রেণির তিনজনকে না দিলে যাকাত আদায় হবে না।

৩) যাকাত স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি। ইমাম নববী র. বলেছেন, ফকির ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে, যাতে তারা অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। উমর রা. বলেন, যখন তোমরা ফকির-মিসকিনকে কিছু দেবে, তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।

৪) ইমাম শাফেয়ি র. শিল্প, ব্যবসায়ে নিয়োজিত গ্রহীতাদের নিজ নিজ কাজে স্বনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন।

৫) ইমাম মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল র. ও অন্যান্য ফকিহগণের মত হলো, ফকির-মিসকিনকে পরিবারের এক বছরের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় যাকাত দিতে হবে।

৬) কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত যাকাত তার অন্তত একদিনের প্রয়োজন মিটানোর পরিমাণের চেয়ে কম হতে পারবে না।

৭) যাকাতের পয়লা হকদার হলেন গরিব আত্মীয়স্বজন। এরপরের অগ্রাধিকার প্রতিবেশী গরিবদের। অন্য এলাকার লোকদের প্রয়োজন অধিক তীব্র ও জরুরি হলে তাদের কাছে যাকাত প্রেরণ করা যায়।

যাদের যাকাত দেওয়া যায় না

১) **নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক :** যে ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম রুপার অথবা নগদ অর্থে, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বা বাণিজ্য পণ্যে সমপরিমাণ সম্পদের মালিক, তাকে যাকাত প্রদান করা যায় না।

২) **অমুসলিম :** অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন যে, অমুসলিমদের যাকাত প্রদান করা যায় না। কারণ, একটি অভিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ধনী সদস্যগণের দ্বারা এর দরিদ্রতর সদস্যদের সাহায্যার্থে এটি হলো একটি বিশেষ ধরনের ধর্মীয় সামাজিক করব্যবস্থা। তাদের মতে, যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান-খয়রাত অমুসলিমদেরকে দেওয়া যেতে পারে।

৩) **পরিবার-পরিজন :** বাবা, মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি প্রমুখকে যাকাত দেওয়া যায় না। আবার স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে না পারলেও স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারে। কারণ, স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর ভরণপোষণ করা; কিন্তু স্ত্রীর সে দায়িত্ব নেই। উক্ত পরিজনবর্গ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়কে যথা : ভাই, বোন, চাচা, চাচি, মামা, মামি, ফুফা, ফুফু, খালা, খালু, চাচাতো ভাইবোন, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রমুখকে যাকাত পরিশোধ করা যায়।

৪) **শিশুদেরকে :** একটি অল্পবয়সী শিশুর অবস্থান তার পিতার অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত। পিতা যদি ধনাঢ্য হন, তাহলে তার শিশুসন্তানও ধনশালী বলে স্বীকৃত হবে। সেক্ষেত্রে শিশুটিকে যাকাত দেওয়া যাবে না। যদি কোনো শিশুর পিতা যাকাত গ্রহণের মতো দরিদ্র হন, কিন্তু মাতা ধনাঢ্য হন, তাহলে শিশুটিকে যাকাত দেওয়া যাবে। কারণ শিশুটির আর্থিক অবস্থান তার পিতার আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত মাতার অবস্থার সাথে নয়। অবশ্য একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে সে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। তখন তার পিতামাতার সম্পদশালীতা বা অন্যবিধ অবস্থা তার নিজের অবস্থানের ওপর কোনো প্রভাব রাখে না।

৫) **সেবার প্রতিদানে যাকাত দেওয়া যায় না :** কোনো ব্যক্তিকে তার কৃত সেবার জন্য প্রতিদানস্বরূপ যাকাত প্রদান করা যায় না। তেমনিভাবে শিক্ষক বা সম্পত্তি তত্ত্বাবধানকারীগণকেও যাকাত দেওয়া যায় না। এ ধরনের ব্যক্তিকে অবশ্য ইচ্ছে করলে উপহার হিসেবে কিছু দেওয়া চলে।

৬) **কর্মচারীকে যাকাত দেওয়া যায় না :** গৃহভৃত্য বা অন্য কোনো কর্মচারীকে মজুরি হিসেবে যাকাত দেওয়া যায় না। অবশ্য মজুরির অতিরিক্ত হিসেবে তাদের যাকাতের অর্থ দেওয়া যায়।

৭) **যাকাত মসজিদে দেওয়া যায় না :** কোনো মসজিদের নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাকাত ব্যয় করা যায় না। কারণ, মসজিদ ধনী-গরিব সকল মুসলিমের ইবাদতের স্থান। এটি কোনো ব্যক্তির নয়।

৮) **দাফন-কাফন :** মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনে যাকাত ব্যবহার করা যায় না। এ ধরনের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যবহৃত হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা গরিব হয়ে থাকলে যাকাত পেতে ও নিতে পারবেন এবং সেই টাকা তাদের মৃত আত্মীয়ের দাফন-কাফনে খরচ করতে পারেন।

৯) **কারেন্সি নোটের মাধ্যমে যাকাত পরিশোধ :** লেনদেনে কারেন্সি নোট বা কাগজের নোটের অবাধ ব্যবহার চলছে। তবে আইনের সূক্ষ্ম অর্থে এরূপ কাগজ হলো তমসুক (promissory note)। সুতরাং এসবের মাধ্যমে পরিশোধিত যাকাত শুধুমাত্র গ্রহীতা কর্তৃক এসবের নগদায়নের পরই কার্যকর হবে।

১০) **ঋণ হিসেবে প্রদত্ত যাকাত :** যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ঋণ হিসেবে যাকাতের টাকা দেন, কিন্তু তা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করেন, তাহলে তার যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালিত হবে। তবে এ টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল বলে যুক্তি দেখিয়ে তিনি তা পরে আদায় করতে পারবেন না।

১১) **উপহার হিসেবে প্রদত্ত যাকাত :** প্রায়ই দেখা যায় যে, যাকাত প্রাপ্যতার অধিকারী ব্যক্তি যাকাত গ্রহণে বিব্রতবোধ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন একটি উপযুক্ত উপলক্ষ্যে তাকে উপহার বা উপঢৌকন আকারেও যাকাতের টাকা দেওয়া যায়। তবে টাকা দেওয়ার সময় প্রদানকারীর মনে

অবশ্যই যাকাত আদায়ের নিয়ত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে দরিদ্র লোকের সন্তানদেরকেও উপহার হিসেবে যাকাতের টাকা দেওয়া যায়।

১২) **নিজের যাকাত দ্বারা ঋণের অর্থ উদ্ধার নয় :** যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তির অন্যের নিকট টাকা পাওনা থাকলেও দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাভাবের কারণে তা পরিশোধে অপারগ। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি নিজেকে নিজে যাকাতের টাকা দিয়ে ভাবতে পারবেন না যে, যাকাত আদায় করা হয়ে গেলো। উক্ত ব্যক্তির নিকট প্রথমে যাকাতের টাকা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরই কেবল ঐ ঋণের টাকা ফেরত চাওয়া ও ফেরত পাবার কাজ সংঘটিত হতে হবে।

১৩) **পাপীকে যাকাত প্রদান :** অন্যায়কারীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যাকাতের যোগ্য হলে সে পাপী হোক বা গুনাহগার হোক, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। কেননা নৈতিকভাবে অধঃপতিত ব্যক্তিদের সংশোধনের একটি বড় উপায় হলো বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা। অধিকন্তু ভালো ব্যবহার দ্বারা তার নফসকে পাক ও পবিত্র করার চেষ্টা করা। কিন্তু সে যাকাতের টাকা নিয়ে আরও পাপে জড়াবে মনে হলে যাকাত দেওয়া উচিত নয়।

যাকাত আদায় সম্পন্ন হবার নীতিমালা

যাকাত ফরজ ইবাদত। তাই যাকাত আদায় হওয়ার জন্য ইসলামের ইবাদত ও মুয়ামালাতের মৌলিক কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে—

১) নিয়ত অবশ্যই দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে। যাকাত ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি নিয়ত ব্যতীত তার যাকাতের পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থ দান করেন, তবুও যাকাত আদায় হয়ে যাবে না। যাকাতের নিয়ত শর্ত।

২) যাকাতগ্রহীতা অবশ্যই উক্ত যাকাতের মালিক হয়ে যাবেন। যাকাতের সম্পদে প্রাপকের মালিকানা নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে যাকাত আদায় হবে না।

৩) শুধু ইসলাম নির্দেশিত ৮টি খাতে যাকাত আদায় করতে হবে।

৪) কোনো ব্যক্তি যদি তার যাকাতের অর্থ আলাদা করে রাখেন এবং উপযুক্ত লোকদের মধ্যে তা পরিশোধ করতে থাকেন, তাহলে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। প্রতিবার বিতরণের সময় নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই।

৫) যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয় এমন কাউকে যাকাত প্রদান করা হলে তিনি তাৎক্ষণিক ফেরত দেবেন। কারণ, যাকাতের টাকা তার জন্য বৈধ নয়।

অগ্রিম যাকাত প্রদান

নিসাব পরিমাণ বা ততোধিক সম্পদের মালিক চন্দ্রবছর পূর্ণ না হলেও যাকাত আদায় করতে পারেন; যা বছর পূর্ণ হবার পর হিসাব কষে সমন্বয় করে নিতে হবে। তবে তার সম্পত্তির পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম থাকলে তার এমনটি করার অনুমতি নেই।

যাকাত ক্যালকুলেটর (একক বা যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায়)

বিবরণ	প্রকৃত মূল্য/পরিমাণ
ক. সম্পদ	
হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ	
সব ধরনের ব্যাংক হিসাবে জমা	
সব ধরনের বিনিয়োগ (স্বর্ণ, শেয়ার, স্টক, বন্ডস, জমি, বাড়ি, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি)'র যাকাত হিসাবকালীন বাজারমূল্য	
বিক্রয়যোগ্য উৎপাদিত মজুদের বাজার মূল্য	
প্রক্রিয়াধীন পণ্য, মজুদ কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রীর বাজার মূল্য	
জামানত ও সব ধরনের অগ্রিম প্রদান	
আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যাংক খঈ গধৎমরহ	
কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ	
ধ্বংসপ্রাপ্ত (স্ক্র্যাপ)/ অবিক্রেয় সম্পত্তির মূল্য	
বাকিতে/ধারে বিক্রয় থেকে প্রাপ্য পরিমাণ	
অন্যান্য উৎস ও পাওনাদি (প্রদত্ত ঋণ, প্রপার্টি থেকে প্রাপ্ত ভাড়া ইত্যাদি)	
মোট সম্পদ	
খ. দায়/দেনা	
মূল ব্যবসায় বিনিয়োগ আকারে ব্যাংক বা ব্যক্তি থেকে গৃহীত লোন-এর বর্তমান যাকাত অর্থবছরে প্রদত্ত কিস্তি (তবে ব্যবসায়ের ফিক্সড অ্যাসেট বাড়াতে গৃহীত লোন দায় হিসেবে পরিগণিত হবে না)	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য সাপ্লায়ার বা এ জাতীয় অন্যদের দেনা	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য কর্মচারীদের পাওনাদি	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে প্রদত্ত অন্যান্য দেনা (যেমন- ভাড়া, ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি)	
খারাপ দেনা	
মোট দায়/ দেনা	
যাকাত ক্যালকুলেশন	
মোট সম্পদ – মোট দায়/দেনা (ক – খ) = নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ: নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ২.৫% হারে (খ্রিষ্টীয় বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে ২.৫৮% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে)	

বি:দ্র: যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির এজিএম-এর সময় এই রেজুলেশন গ্রহণ করতে হবে যে, এই কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী সকলের যাকাত কোম্পানি প্রদান করবে অথবা সকল বিনিয়োগকারী তাদের অংশের যাকাত আলাদাভাবে প্রদান করবেন।

যাকাত ক্যালকুলেটর (ব্যক্তিগত)

ক. সম্পদ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত	গ্রাম অনুযায়ী ওজন	প্রতি গ্রামের বিক্রয় মূল্য	মোট বিক্রয় মূল্য

নগদ ও ব্যাংকের টাকার যাকাত	প্রকৃত মূল্য/পরিমাণ
নগদ টাকা	
ব্যাংকে সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স	
ফিক্সড ডিপোজিট, ডিপিএস, বিশেষ জমা (যেমন- হজ্জ, বিয়ে ইত্যাদির জন্য)	
বীমা ও বীমা প্রিমিয়ামের বোনাস	
শেয়ার, স্টক, সঞ্চয়পত্র, বন্ড ইত্যাদি (যাকাত প্রদানের দিনের মূল্য)	
ঋণ/পাওনা/ধার/অগ্রিম ইত্যাদির যাকাত	
বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে নিশ্চিত ফেরৎ পাবে এমন ঋণ/পাওনা	
জামানত হিসেবে জমা (যা ফেরত পাওয়া যাবে) এবং অগ্রিম পরিশোধিত	
প্রভিডেন্ট ফান্ড (যদি উত্তোলনযোগ্য হয়)	
জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট যা পরবর্তীতে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রয় করা হয়েছে	
অন্যান্য আয়ের উৎস (যেমন- বেতন, সম্মানী, উপহার, পুরস্কার, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি) থেকে ব্যয়-পরবর্তী উদ্বৃত্ত	
মোট সম্পদ	

খ. দায়/দেনা

বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য ব্যক্তি-দেনা	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য ব্যাংক লোন	
অন্যান্য দেনা (যেমন- বাড়ি ভাড়া, ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি)	
মোট দায়/দেনা	

যাকাত ক্যালকুলেশন

মোট সম্পদ – মোট দায়/দেনা (ক – খ) = নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ: নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ২.৫% হারে (খ্রিষ্টীয় বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে ২.৫৮% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে)	

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

যাকাতের মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থিকভাবে সচ্ছল করে তোলা, যাতে আজকের যাকাতগ্রহীতা আগামীতে যাকাতদাতা হতে পারেন। যাকাত ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যাকাত আদায় ও বিতরণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হচ্ছে না। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের কার্যকর কোনো ভূমিকা দৃশ্যমান হচ্ছে না। ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে টেকসইভাবে কিছু করা সম্ভব হয় না বিধায় অনেক দেশে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যাকাত তহবিল গঠন করে তা বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ফরজ বা অবশ্যপালনীয় বিধান হিসেবে যাকাতের তাৎপর্য সকলের কাছে তুলে ধরা, যাকাত সংগ্রহ এবং তা থেকে পরিকল্পিত উপায়ে দুঃস্থ ও বিপন্ন মানুষকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট নিঃস্ব ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে যাকাতের অর্থের কার্যকরী ব্যবহার, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সিজেডএম কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সিজেডএম আয়বর্ধক ও সমন্বিত প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি প্রদান, বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান, বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা, অসহায় নারীদের স্বাস্থ্যসেবা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নানা ধরনের মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত কর্মসূচি থেকে হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সুফল ভোগ করছে। এ ছাড়াও সিজেডএম সমাজে যাকাত সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মশালা, সেমিনার, রাউন্ড টেবিল, সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নানা ধরনের প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

ফোন : +৮৮ ০২ ২২২২ ৯৮ ২৫৫, ০১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬

ই-মেইল : info@czm-bd.org **ওয়েবসাইট :** www.czm-bd.org